দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ২ জুন - ২০১৪।। ১৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

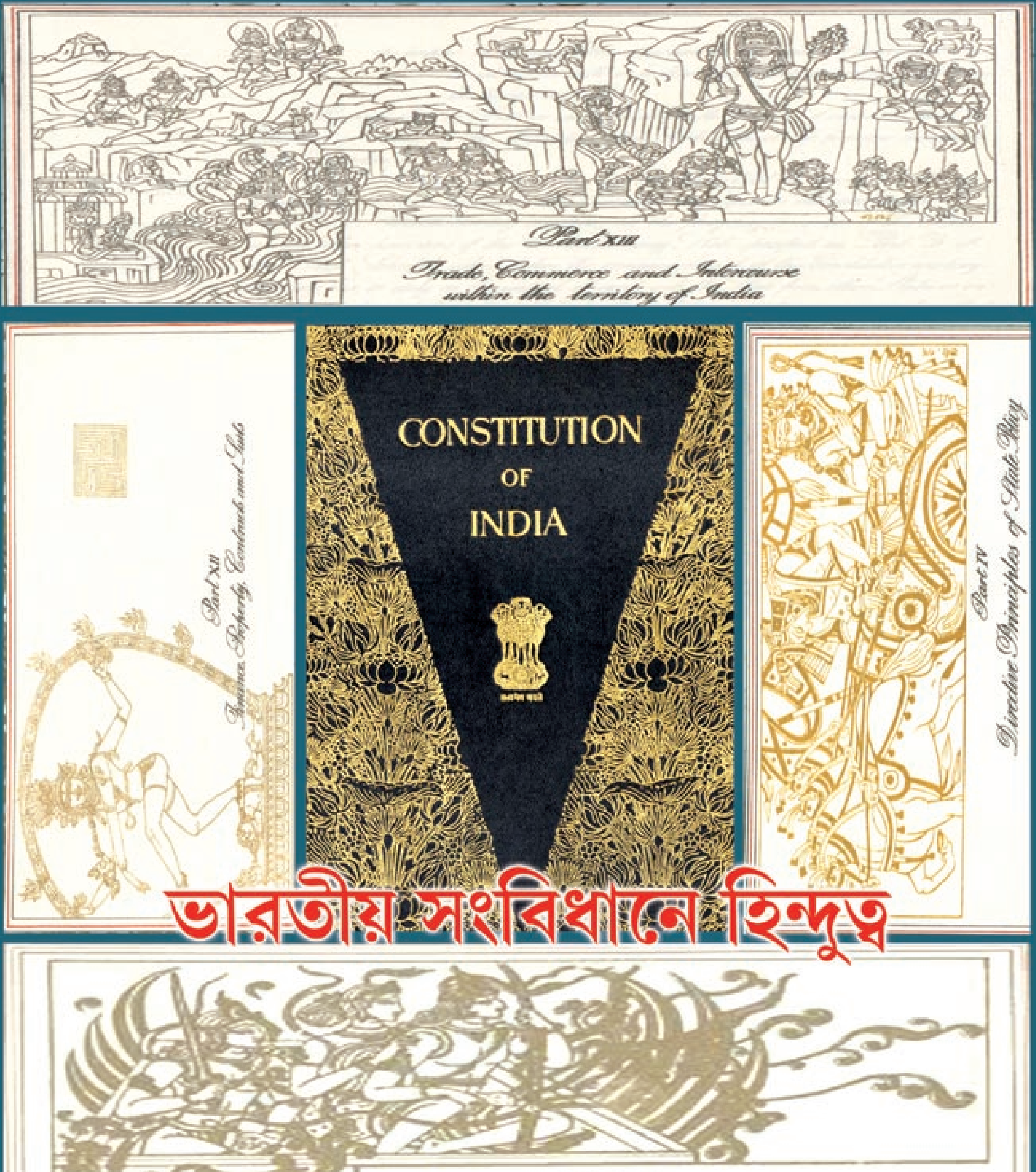

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুত্ব

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯
একান্ত সাক্ষাৎকার : ইন্দ্রেশকুমার □ ৮
সারদা রহস্য ফাঁসের জুজু দেখিয়ে
মুকুল-বকুল বাজি মেরে দিল □ গূঢ়পুরুষ □ ১০
খোলাচিঠি : জিতেও গোহারা দিদিভাই □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
এই জয়ের কান্ডারি কে? □ দেবীপ্রসাদ রায় □ ১২
ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুত্ব উপাদান এবং
ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব □ উপানন্দ ব্রহ্মচারী □ ১৩
সংস্কৃতি ও সন্ত্রাস □ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৬
থিম স্টাডি □ অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সরকার □ ২০
আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাসের আলোকে মথুরা-বৃন্দাবন □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২১
মোদীর জয়ের নেপথ্যে □ তভলীন সিং □ ২৭
ভারতমাতার শৃঙ্খলমুক্তি □ ড: দীনেশচন্দ্র সিংহ □ ২৮
ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ : নরেন্দ্র মোদীর বিজয়পর্ব □ কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী □ ২৯
বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হলে তো ভারতের অধিকাংশ
মানুষ সাম্প্রদায়িক □ প্রবীর ঘোষ □ ৩০
ভারতের হিতে ভারতীয় হিন্দুদের যুদ্ধে নামতে হবে □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২
মোদী : বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারি □ নীতিন রায় □ ৩৭

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

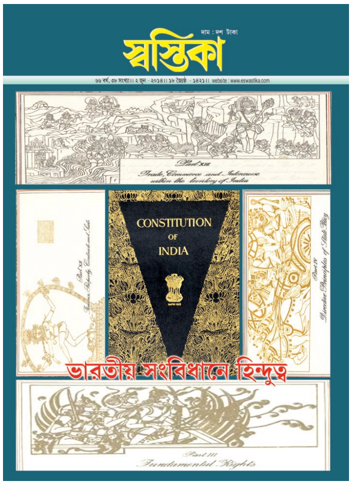

পৃঃ ১৩ - ১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □
অন্যরকম : ৩৩ □ □ সুস্বাস্থ্য : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ খেলা: ৩৯
শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৬, ২ জুন - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
৯ই জুন
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিশেষ সংখ্যা (সম্পূর্ণ রঙিন)

প্রকাশিত হবে
৯ই জুন
২০১৪

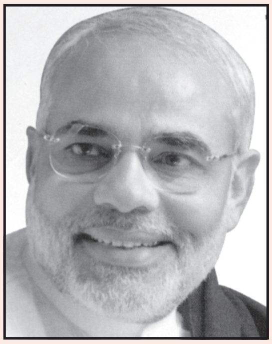

শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক বিজয়ে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তার নবজাগরণের সূচনা হলো, যা বিশ্বে ভারতবর্ষকে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশের এই শুভ মুহূর্তটিকে ধরে রাখার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী' সংখ্যা। তথ্য ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য।

।। দাম ১৫.০০ টাকা মাত্র ।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

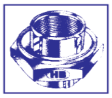
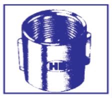

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ সৌজন্যের প্রকাশ

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পরিণাম ভারতীয় রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 'দাঙ্গাবাজ', 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' বলিয়া অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদীই আজ সমগ্র ভারতকে একসূত্রে বাঁধিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা লইতেছেন, গোটা বিশ্বকেই আপন করিয়া লইবার ডাক দিয়াছেন। তাঁহার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানদেরও আমন্ত্রণ জানাইয়া সেই বার্তাই তিনি দিয়াছেন। সকলকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। স্বামী বিবেকানন্দ অনুসৃত বেদান্তদর্শনের বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বামীজীর অনুগামী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনপর্বে স্বামীজীর পথ অনুসরণ করিয়া গোটা ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। দেখিয়াছেন জাতপাত, ধর্মীয় বিভাজন ও আঞ্চলিকতাবাদের দাপট। সংখ্যালঘুদের মানোন্নয়ন নয়, তাহাদের রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার অপকৌশল। দরিদ্র, নিপীড়িত চন্ডাল ভারতবাসী অপশাসন, কুশাসন, অর্থনীতির অবনমন, মূল্যবৃদ্ধি ও লাগামছাড়া দুর্নীতির চাপে রিক্ত, বিধ্বস্ত ও অবসাদগ্রস্ত। শতধা বিচ্ছিন্ন দেশের টুকরো টুকরো অংশকে উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে মেলবন্ধন ঘটাইয়া একবৃত্তে লইয়া আসিবার মূল কান্ডারি তিনি। নরেন্দ্র মোদীই আজ পুনরায় ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিবার প্রধান পুরোহিত। বিগত আড়াই দশক ধরিয়া আঞ্চলিকতাবাদের দাপটে দেশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন লালু, মুলায়ম, মায়াবতী, নিতীশকুমারেরা। মোদীর এই ভারতবিজয়ে জনগণমন পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখনও কেহ কেহ বলিতেছেন, কেবল উন্নয়ন নয়, ধর্মের কথাও স্থানে স্থানে বলিয়াছেন মোদী। ভুলিলে চলিবে না, ধর্মই ভারতীয় সমাজের প্রাণবায়ু। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ ভারত নির্মাণে এই ধর্মের আবশ্যিকতা তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনার বিচিত্র প্রকাশের এক অপূর্ব সমন্বয়ের প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ অনুগামী নরেন্দ্র মোদী এইবারের নির্বাচনে সেই পথই অনুসরণ করিয়াছেন। এবারের নির্বাচনে তাঁহার প্রচারাভিযান ছিল বেদান্ত অনুসারী। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সে জাতি কখনো বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পিতৃপরিচয়বিস্মৃত এই হতভাগ্য জাতির আত্মপরিচিতির নষ্ট কোষ্ঠী একদা স্বামী বিবেকানন্দ উদ্ধার করিয়া জাতির হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। অপদার্থ অক্ষম উত্তরাধিকারী আমরা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার কৌশলে কবেই তাহা আবার হারাইয়া ফেলিয়াছি। নরেন্দ্র মোদী সেই ঐতিহ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হইয়াছেন। উপনিষদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বাণীকে সার্থক করিতে প্রতিবেশীদের প্রতি উদার হইয়াছেন। ভারতকান্ডারির দায়িত্ব পাইয়া পাকিস্তানকেও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর জামানায় ভারত-পাক সম্পর্কে যে নতুন দিগন্ত খুলিয়াছিল, তাহা পুনরায় উন্মোচন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তিনি।

মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়করা আমন্ত্রিত হওয়ায় অনেকে বিরোধিতা করিয়াছেন। বিশেষত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণে। কিন্তু কেন এই বিরোধিতা? মনে রাখিতে হইবে, আমন্ত্রণ জানাইবার এই সিদ্ধান্তটি একটি আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের পরিচায়ক, ইহা কোনো কূটনৈতিক আলোচনার প্রস্তাব নহে। পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ এই সৌজন্যেরই প্রকাশ।

সুভাষিত

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন সুখং নাপুনর্ভবম্
কাময়েদুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।।

— *ভর্তৃহরি নীতিশতক*

অর্থ— আমি রাজ্য চাইনা, সুখ চাইনা, মোক্ষও আমার দরকার নেই। আমি শুধু দুঃখীজনের দুঃখ দূর করতে চাই।

মোদীর শপথ : সাক্ষী এশিয়ার ভাবী প্রজন্মের নেতৃবর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে ২৬ মে ২০১৪ তারিখটি স্মরণীয় হয়ে রইল। দেশের দুই তৃতীয়াংশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নরেন্দ্র মোদী হতে চলেছেন ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী। আগামী দিনে তিনিই যে এশিয়ার নেতা হবেন সেটাও পরিষ্কার। তাই তার প্রাক-পর্বেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল— সার্কভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের পরিবারের শক্ত ঘাঁটি হামবানতোতা থেকে নির্বাচিত সাংসদও। রাজনীতির পাশাপাশি নামাল রাজাপক্ষে একজন ক্রীড়াবিদও। তিনি রাগবিতে শ্রীলঙ্কার হয়ে অধিনায়কের দায়িত্বও সামলেছেন। নামাল সম্প্রতি মুম্বাইতে ছিলেন তার টুর্নামেন্টের জন্য। শ্রীলঙ্কায় ভাই ইয়োসিদার সঙ্গে তিনি কার্লটন স্পোর্টস নেটওয়ার্ক নামে একটি ক্রীড়া-জীবনশৈলী ও ব্যবসায়িক টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানা লাভ করেছেন। নামাল একটি যুব সংগঠনেরও থেকে শুরু হয়ে আরো অনেক হেভিওয়েট রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে এই মহাসমারোহে উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে এটা বেশ পরিষ্কার যে এশিয়ার আগামী দিনের ভাবী নেতৃবর্গ সবচেয়ে শক্তিশালী নেতার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একটাই বার্তাই দিচ্ছেন— সেটা হলো পূর্বাকাশে ভারত সূর্যের উদয়ে সকলেই শরিক এবং আগামী দিনেও যাতে এই ধারা অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে এখন থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাবী

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সঙ্গে সাক্ষী থাকলেন তাঁদের সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীরা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে তাঁর পুত্র হুসেইন নওয়াজ এবং কন্যা মারিয়মও মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী। হুসেইন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনিই মূলত পরিবারের প্রধান রসদদার। অন্যদিকে শরীফ কন্যা মারিয়াম একজন সক্রিয় রাজনীতিক। সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সুসম্পর্ক বিষয় বেশ আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি। বলেছেন, কোরিয়া না ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ— কার মতো আমরা থাকবো তা স্থির করতে হবে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষের পুত্র নামাল রাজাপক্ষেও বাবার সঙ্গে মোদীর শপথ গ্রহণের অন্যতম সাক্ষী। নামাল প্রধান। 'তারুণ্য মাহেতব' অর্থাৎ 'আগামীদিন যুবদের জন্য' নামে একটি সংগঠনের প্রধান তিনি।

সূত্রের আরো খবর, রাজাপক্ষের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী জি. এল. পেইরিস এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত। মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিন গেয়ুম তাঁর ভাইঝি দুনইয়া মাউমুন-সহ প্রতিনিধিত্ব করবেন। দুনইয়া মাউমুন বর্তমান বিদেশমন্ত্রী মালদ্বীপের। নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কইরালা ও তাঁর ভাইঝি সুজাতা- সহ মোদীর শপথে সাক্ষী। সুজাতা কইরালা পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী পি এম জি পি কইরালার কন্যা। সঙ্গে তাঁর ভাই শশাঙ্ক কইরালাও থাকলেন। ভাইপো-ভাইঝি-সহ নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রজন্মকেও সেই উত্তরাধিকারই তুলে দিতে আগ্রহী তাঁরা।

মোদীর শপথ গ্রহণে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ও কর্মকর্তা-সহ ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক সংস্থার কর্ণধাররাও সাক্ষী। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে গৌতম আদানি, মুকেশ ও অনিল আম্বানী এবং অজয় বিশেষভাবে শ্রীরাম এই অনুষ্ঠানে নিজের নিজের উপস্থিতিতে সপ্রতিভ ছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো প্রধানমন্ত্রী যাঁর শপথের সাক্ষী থাকছে অর্ধেক বিশ্ব। নরেন্দ্র মোদী ভারতকে আবার জগৎসভায় তুলে ধরলেন এক অন্য মাত্রায়।

সংবাদ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনার পূর্বমুখী কূটনীতি নতুন বন্ধুর খোঁজে?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ মূলত ভারতের কংগ্রেস সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে আওয়ামি লিগ গত ৫ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনে টানা দ্বিতীয় বারের মতো সরকার গঠন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন নানাভাবে চাপ দিয়েছিল নির্বাচন বন্ধের জন্যে। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা বন্ধ করে দেয়। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামি রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করছিল নির্বাচন বানচাল করতে। একমাত্র ভারত পাশে থাকায় শেখ হাসিনা এই ভয়ঙ্কর প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলায় সফল হন। চীন ও রাশিয়া দূর থেকে পরিস্থিতি দেখছিল অবস্থা কী দাঁড়ায়! রক্তপাত সত্ত্বেও যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং শেখ হাসিনা তৃতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, চীন ও রাশিয়া নতুন সরকারকে দ্রুত সমর্থন দিয়ে হাসিনার পাশে এসে দাঁড়ায়। বিশ্ব রাজনীতিতে এটা সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ধরনের পরাজয়। একাত্তর সালের পর ভারত দ্বিতীয় বার বাংলাদেশকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করল।

বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোয় একাত্তরে ভারতকে মূল্য দিতে হয়েছিল। এবারও আমেরিকা মুখোমুখি দাঁড়াল ভারতের। পরে অবস্থা বুঝে লেজ গুটিয়ে ফেলে। শেখ হাসিনা নতুন প্রাণ পেয়েছেন, সম্ভবত নতুন চিন্তা এখন মাথায় ভর করেছে। ইদানীং পূর্বমুখী কূটনীতির দিকে ঝুঁকছেন বলে মনে হয়। চীনকে বিকল্প বন্ধু হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা আগেও ছিল, এখন সেটা আরও গতি লাভ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সরকার পূর্বমুখী কূটনীতির কথা বলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই অংশ হিসেবে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সফরে যাচ্ছেন। এ মাসের শেষ দিকে সফর করবেন জাপান, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬ দিনের সফরে যাবেন চীন। সেখানে সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির

শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে। বাদবাকি সফরগুলোর দিনক্ষণ স্থির করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে ব্যস্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ইয়ান জুনকি এ মাসের মাঝামাঝি ঢাকা সফরে এসে শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন। দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তিনি শেখ হাসিনার ওপর বাংলাদেশের মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার প্রতিফলন দেখেছেন। হাসিনাও বলেছেন, তিনি চীনকে খুব কাছের বন্ধু বলে বিবেচনা করেন। উল্লেখ্য, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনা অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলাদেশের গণহত্যায়, মুক্তিযোদ্ধাদের নিধনে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে অস্ত্র সমর্পণের পর বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও চীন দেয়নি। চীনের স্বীকৃতি এসেছিল ১৯৭৫ সালে সেনা কর্মকর্তাদের হাতে হাসিনার পিতা, জাতির জনক শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার অব্যবহিত পর। ওই অভ্যুত্থানের সময় মুজিবের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান। বিশ্বের কোনো দেশ তাঁদের আশ্রয় দিতে সম্মত হয়নি, শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পান ভারতে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

এরই মধ্যে ভারতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি জোট সরকার বিশাল বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর উপমহাদেশের রাজনীতি নতুন মেরুকরণের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। বাংলাদেশেও তোলপাড় হয়েছে। সাবেক বিরোধী নেত্রী জিয়া সবার আগে নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানান। তারও আগে, মোদী প্রধানমন্ত্রী পদে নিজ দল বিজেপি-র মনোনয়ন লাভের আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে গুজরাট পাঠান ভারতের ভাবী নেতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে। হাসিনা নিশ্চয়ই আঁচ করেছিলেন, দিল্লীতে ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে। ১৬ মে ভোট গণনার সকালেই পরবর্তী ভারত শাসনের চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসিনা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠান নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি প্রধান রাজনাথের কাছে। তার একদিন পরই অর্থাৎ ১৮ মে সকালে সরাসরি টেলিফোন করেন মোদীকে। প্রথম বিদেশ সফরে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানান। দু'দেশের একসাথে কাজ করার কথা বলেন। মোদীর শপথ গ্রহণের পরই শেখ হাসিনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টাকে দিল্লী পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে খালেদা জিয়াও দলের শীর্ষ নেতাদের দিল্লী পাঠাচ্ছেন শিগগিরই, এমনটা জানা গেছে দলের অন্দরমহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে।

বাংলাদেশে পূর্বমুখী রাজনীতির সূচনা করতে চেয়েছিলেন খালেদা জিয়া। তিনি শেষ পর্যন্ত অতোটা এগোতে পারেননি। শেখ হাসিনা কোমর বেঁধেছেন, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী এসে পড়লেন ঝড় তুলে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর এবার ভারতে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তা নড়বড়ে বা আঞ্চলিক দলগুলোর ওপর নির্ভরশীল কোনো সরকার নয়। মোদী একাই একশো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতের নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি দেখেশুনে তবেই এগোনো উচিত। কারণ চীন সফর করার আগেই কিছু সামরিক চুক্তি হয়েছে, পদ্মা সেতুর কাজটা পাচ্ছে চীনা কোম্পানি।

‘সন্ত্রাসের অভিযোগে ধৃত নির্দোষ সবাইকে জামিন দেওয়া হোক’

এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে দিয়ে দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা পেয়েছে এবং যার কান্ডারি দেশবাসী নিজেই, এমনটাই মনে করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য ও মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সংগঠক ইন্দ্রেশকুমার। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি উত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি এটাও বলেন, পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে জোর করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে দেওয়া হয়, যদিও কোনো তথ্য প্রমাণ চার্জশীট কিছুই দিতে পারেনি তারা। এইভাবে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় যাঁদের জড়িয়ে আটক করা হয়েছে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষেই সমস্ত নির্দোষদের মামলাগুলি নতুন সরকার খতিয়ে দেখুন এবং নিরীহদের মুক্তি দিন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দশ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়েছে বিজেপি, সুতরাং কংগ্রেস মুসলমানদেরও বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বছর ৬৫'র এই প্রবীণ আর এস এস কার্যকর্তার সাক্ষাৎকারে এভাবেই একের পর এক ইস্যু উঠে এসেছে। সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো।

□ আপনি তো মুসলমানদের ভিতর কাজ করেছেন। এই নির্বাচনে বিজেপি কি মুসলমান ভোট পেয়েছে?

□ ৬৫ বছরের ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানরাও আজ সঙ্কটের মুখে। তারা কংগ্রেসের প্রতি ক্ষুব্ধ এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে আজ তারা ঘৃণার চোখে দেখছে, এতদিন যাদের তারা ভোট দিয়ে এসেছে। তারা বুঝতে পেরেছে ভোট দিয়ে কিছুই পাওয়ার নেই। অন্যদিকে আর এস এস বা বিজেপি-র থেকে মুখ ফিরিয়েও বিশেষ লাভ নেই। তাই এবার ১০-১২ শতাংশ মুসলমান ভোট দানে বিরত ছিল। কিন্তু আমার ধারণায় প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ৪-৫ শতাংশ থেকে ১৯-২০ শতাংশ মুসলমান ভোট বিজেপি পেয়েছে। গড়ে ৯-১০ শতাংশ ভোট নিশ্চিৎ ভাবেই বিজেপি পেয়েছে।

□ কিভাবে এটা বলেছেন?

□ কিছু সংখ্যক ধর্মীয় নেতারা, যেমন ইমাম এবং জামা মসজিদ, দারুল উলুমের পক্ষে বিশেষ কিছু দলকে ভোট দেওয়ার জন্য বলা হলেও এবারে মুসলমানদের ভিতর থেকেই এই ধরনের ফতোয়ার বিরোধিতার সুর উঠে এসেছে। তাই এবারের নির্বাচনে মুসলমানরা তাদের বিবেক অনুসারে ভোট দিয়েছে।

যথাশীঘ্র সম্ভব তদন্তকারী সংস্থাগুলি চার্জশীট দিক

— ইন্দ্রেশকুমার

□ কি কারণে মুসলমানরা বিজেপি-কে ভোট দিচ্ছে?

□ মুসলমানরা বিজেপি-র মধ্যে নতুন আশা খুঁজে পাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, ‘কাতিল সাবিত হোতা হুঁ তো মুঝে মাফি নেহি দেনা, ফাঁসি পে লটকা দেনা’ অর্থাৎ খুনি প্রমাণিত হলে, ‘আমাকে ক্ষমা করো না, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিও’। এই কথায় যে ‘পুরুষালী জোস’ রয়েছে তা মুসলিমদের অন্তর স্পর্শ করেছে। কোনো দলের কোনো নেতা এধরনের কথা বলার সাহস দেখান না।

□ প্রথমবার একটা বিজেপি সরকার ক্ষমতাশীল হয়েছে, নিজে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুসলমানদের জন্য যে বহু কল্যাণমুখী প্রকল্প রয়েছে, আপনার কি মনে হয়; সেগুলি পুনর্বিবেচনার দরকার?

□ সংখ্যালঘুদের ভিতর শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নই

সবচেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িকতা দোষে পুষ্ট। কেন খৃস্টান, শিখ, জৈন অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিষয় বলছেন না। মুসলমানদের নামে প্রতারণা চলছে। তারা ভীষণ ভাবে প্রতারিত। যেখানে অন্যান্যরা সামান্যই সুযোগ সুবিধে পায়, তারা কীভাবে উন্নতি করে? আর মুসলমানরা যেই তিমিরে— সেই তিমিরেই থেকে যায়? এ বিষয়ে ভাবা উচিত তাদের। 'ঘৃণা' কিংবা 'তোষণের' ভিত্তিতে কোনো প্রকল্প যোজনা থাকা উচিত নয়। আজ ভোট কেনার জন্য শুধু কাগজে কলমে কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে।

নতুন সরকার কি এইসব প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন করবেন?

মুসলমানদের তরফ থেকেই এই দাবি উঠে এসেছে যে তোষণের এই রাজনীতি বন্ধ হোক। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লোকমান্য তিলক, ঝাঁসীর রাণী, রহিম, বাহাদুর শা' জাফর, শিবাজীর নামে কোনো জনমুখী প্রকল্প এতদিন পর্যন্ত হয়নি। আমাদের জাতীয় মনীষীদের প্রতি এই ধরনের বিমুখতা বা গোড়ামি চিন্তাধারা শেষ হোক। আমি নিশ্চিত— মুসলমানরাও এক বিষয়ে একই মত পোষণ করবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেও শুভ সংকেত আসছে। জম্মু-কাশ্মীরে হিংসার অন্যতম কারণ এই ৩৭০ ধারা। গত বছর এর প্রতিবাদে আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম। লক্ষ লক্ষ মুসলমানরাও স্বাক্ষর করেছিল। সেইসব স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটাও মনে করে দেখুন, শীর্ষ আদালতের রায়ের পর অযোধ্যায় কোনো সংঘর্ষ হয়নি আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। আমার অভিজ্ঞতা, যা মুসলমানদের ভিতর কাজ করার সূত্রে পেয়েছি, তা থেকে বলতে পারি— মুসলমানরা দেশের সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানই চায়।

বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আপনার নাম জড়িয়ে, পূর্বতন সরকার আপনাকে নানা মামলায় অভিযুক্ত করেছে। বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। নতুন সরকারের কাছে গৈরিক সন্ত্রাস সংক্রান্ত মামলায় যে আপনাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সে বিষয় কি দাবি করবেন?

প্রথম দিন থেকে আমি বলেছি, এটা হচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের রাজনৈতিক চক্রান্ত। সিবিআই, এন আই এ, এ টি এস— সব কটি সংস্থাকেই অপব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক ভাবে। এত বছর ধরে কাজ করেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। তারা আমায় অভিযুক্ত করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কিছুই পায়নি। সরকার হচ্ছে অপরাধী। আমি কখনোই বলব না গৈরিক সন্ত্রাস মামলায় অভিযুক্ত সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হোক্। কিন্তু তাদের জামিন পাওয়া উচিত। নির্দোষ মুসলমানদেরও জামিন দেওয়া হোক। তদন্তকারী সংস্থাগুলি চার্জশীট দিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং যারা নির্দোষ তাদের বেকসুর খালাস করা হোক। এখনও সরকার গঠন হয়নি, কিন্তু আমি বলতে পারি আমরা কোনো আনুকূল্যে চাই না। কিন্তু যারা অবিচার ও অত্যাচারের শিকার তাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। এটা চার মাস থেকে এক বছর লাগতে পারে কিন্তু প্রক্রিয়াটা দ্রুত শুরু হওয়া আবশ্যিক। এবারের নির্বাচনী ফলাফল দ্বিতীয় স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে যা আমাদের জনগণই প্রদান করেছেন। দিগ্বিজয় সিং, মনীশ তিওয়ারীর মতো কংগ্রেস নেতাদের বোঝা দরকার যে কারো জীবন নষ্ট করার অধিকার তাদের নেই। এই সমস্ত নেতা আর তদন্তকারী সংস্থার উচিত সর্বজন সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

রামমন্দির, ৩৭০ ধারা এবং সাধারণ নাগরিক বিধি (Common Civil Code) এই তিনটের মধ্যে কোনটি সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে নতুন সরকারের নজরে?

ফারুক আবদুল্লাহ ৩৭০ ধারার পক্ষে, কিন্তু এবারের নির্বাচনের পর এটা পরিষ্কার যে তিনি এবং ওমর পায়ের তলার মাটি হারিয়েছেন। আমাদের সংবিধান সমান নাগরিক বিধি সম্পন্ন সংবিধান, ভুল ব্যাখ্যার জন্য সমস্যা তৈরি হয়। সঠিক দৃষ্টিতে ভাবলে তো দরকারই পড়বে না সমান নাগরিক বিধির।

(সৌজন্যে : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

আলকায়দা-তালিবানদের ছত্রছায়ায় এবার সিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে এখন সিমি বা স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সম্প্রতি আলকায়দা এবং তালিবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিমি আবার সংগঠন ঢেলে সাজাতে চাইছে। ঠিক যেমন আই এস আই-এর মদতপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। মধ্যপ্রদেশে সিমি-র এক সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় তার কাছ থেকে একটি ভিডিও রেকর্ড উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ভিডিও থেকে বেশ কিছু সিমির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। তবে মধ্যপ্রদেশে সিমি সংগঠন প্রসঙ্গে অপরাধ দমন শাখা জানিয়েছে— সিমি এবং মুজাহিদিন-এর মতো দুই সংগঠনের মতাদর্শ এক হলেও তারা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। তারা এখন যে জোট বেঁধে কাজ করছে তা কিন্তু নয়।

সিমি ক্রমশ আলকায়েদা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বাড়িয়ে তুলেছে। ৯/১১-এর ঘটনায় অভিযুক্ত এবং ইউনাইটেড স্টেট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নায়ুবিজ্ঞানী আফিয়া সিদ্দিকী বর্তমানে এফ বি আই-এর হাতে। আলকায়দার প্রধান আবুফয়জল এটি এস নামক এক সংবাদসংস্থাকে জানায়, তাদের পরিকল্পনা ছিল আমেরিকান পর্যটকদের অপহরণ করে সিদ্দিকীকে এফ বি আই-এর কাছ থেকে মুক্ত করা। এরকমই পরিকল্পনা ছিল ধৃত জঙ্গি ইয়াসিন ভাটকলের। গত বছর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন দিল্লীর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)-এর এক অফিসারকে একথা জানায় সে। ২০১২ সালে নেপাল থেকে গ্রেফতার হয় ইয়াসিন ভাটকল। এবং সেই সঙ্গে ভাটকল স্বীকার করে যে ইউনাইটেড স্টেট-এর হাত থেকে সিদ্দিকীকে মুক্ত করার জন্য ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন চেয়েছিল ভারত থেকে এক ইহুদি (জিউস)-কে অপহরণ করতে। সংবাদসংস্থা এটি এস-কে তারা জানায় যে পাকিস্তানে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কোনোরকম বোমা বিস্ফোরণ বা অপহরণের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান দুতাবাস ছিল তাদের তালিকায় প্রথম। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল নরেন্দ্র মোদী।

সংবাদ প্রতিবেদন

সারদা রহস্য ফাঁসের জুজু দেখিয়ে মুকুল-বকুল বাজি মেরে দিল

দিদির এখন বিস্তর গোঁসা হয়েছে। মুকুল-বকুলরা নির্বাচনের সময় তাঁকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। মুকুল-বকুলরা বলেছিল লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি-র ভরাডুবি হবে। কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারবে না। দিদির সমর্থন চাইতে হবে। আর তখনই দিদি সুযোগ পেয়ে মোদীবাবুকে একটা বড় 'কানচাপাটি' দিয়ে দেবেন। মোদীবাবুকে কানচাপাটি দেওয়াটা দিদির এক নম্বর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের কাছে। দিদির 'হরিদাস' মোদীবাবুকে কানচাপাটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে রাজ্যের মুসলমান ভোটদাতারা দলে দলে দিদির প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে। এখন গোল বেঁধেছে মোদীবাবু এবং তাঁর দল বিজেপি একাই সরকার গড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায়। দিদিকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। না দেওয়ারই কথা। কারণ, দিদির নিজস্ব বাংলা ভাষার অভিধানে হয়তো কানচাপাটি কথাটা আছে। কিন্তু সংসদ বাংলা অভিধান বা বাজার চলতি বাংলা ভাষার সব অভিধানে এই 'কানচাপাটি' কথাটি নেই। সাধারণভাবে আধুনিক, মধ্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালির মান্য চলিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সম্ভার অভিধানে থাকে। কিন্তু কোথাও দিদির কানচাপাটি কথাটি নেই। অথচ অন্য অনেক কথা আছে। যেমন, কান কাটা, কান দেওয়া, কান ধরা, কান পাকা, কান পাতা, কান ভাঙানো, কান মলা, কানে ওঠা, কানে তোলা, কান খুস্কি, কান ফাটানো ইত্যাদি। শুধু দিদির বলা কানচাপাটি কথাটি নেই। ফলে বিপদে পড়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কলকাতা অফিসের কর্মীরা। তাঁদের উপর দায়িত্ব ছিল দিদির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির এক নম্বরে থাকা 'কানচাপাটি' কথাটির ইংরেজি এবং হিন্দি তর্জমা করে দিল্লীতে পাঠানো। নিরুপায় হয়ে তাঁরা দালাল মারফত দিদির দুই অনুগত সহচর মুকল-বকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুকুল বলেন, 'কানচাপাটির অর্থ হচ্ছে দুই কানে গরম গরম ছোট ছোট হাতে গড়া রুটি চাপা দিয়ে তার উপর গামছা দিয়ে জোরসে বেঁধে দেওয়া।' বাংলার বাইরে বেশ কিছু রাজ্যে হাতে গড়া আটার রুটিকে চাপাটি বলে। বকুল অবশ্য অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। বকুলবাবু জানান, 'মুকুলদা কিছুটা ঠিক বলেছেন। তবে দিদি মানুষের খাদ্য আটার চাপাটি ব্যবহার করার কথা বলেননি। কারণ, খাদ্যের অপব্যবহার দিদির মোটেই পছন্দ

গূঢ়পুরুষের কলম

নয়। দিদি যদিও চাপাটির কথাটা বলেছেন, তবে সেটা ব্যঙ্গার্থে। দিদির ইচ্ছা ছিল মোদীবাবুর কান কার্পাস তুলো দিয়ে বন্ধ করার।' মুকুল-বকুলের দুটি ব্যাখ্যাই অনুবাদ করে দিল্লীতে পাঠান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে মোদীজীর দুটি কান বন্ধ করে দিলে দিদির রাজনৈতিক লাভটা কী। বরং ক্ষতিটা অনেক বেশি। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে দিদির ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে হবে না। তাই মোদীবাবুকে এবার কানচাপাটি দেওয়া গেল না বলে দিদির গোঁসা করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে কি?

দিদি অভিমান করে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাননি। তাঁর অনুগত মুকুল-বকুলকে পাঠিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ফিরে এসে তাঁদের রিপোর্ট করা যে দিল্লীতে কোন দলের কোন নেতারা বিজেপিতে ঢুকতে চাইছেন। মুকুল-বকুল কলকাতায় ফিরে দিদিকে গোপনে জানিয়েছেন যে সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি শপথ অনুষ্ঠানের পর এক প্লেট ঢোকলা বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছেন। টেবিলে বাংলার সংস্কৃতি বহনকারী বড় বড় রসোগোল্লা সন্দেশ থাকলেও সেদিকে হাত বাড়াননি। দিদি মুকুল-বকুলকে নিষেধ করেছিলেন চা জলখাবারের টেবিলের দিকে না যেতে। কিন্তু বড় বড় রসোগোল্লা আর পেল্লাই সাইজের গরম গরম সিঙাড়া দেখে তাঁরা লোভ সামলাতে পারেননি। তবে তাঁরা যে গুজরাটি খাবার মুখে তোলেনি সে কথা শপথ করে বলেছেন। দিদি সব শুনে বলেছেন, 'সিপিএম যখন ঢোকলা খেতে শুরু করেছে তখন আমাদের আরও সাবধান হতে হবে। যে কোনওদিন বিমান-বুদ্ধ-কারাত-ইয়েচুরিরা লাল ঝাণ্ডা ফেলে গেরুয়া ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিতে পারে।' দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে ইয়েচুরির যথেষ্ট প্রভাব আছে। দিদি বলেছেন, সিপিএম এমন গিরগিটির মতো রং বদলাবে তা আগেই তিনি জানতেন বলেই এবার টলিউডের এক ঝাঁক তারকাদের নির্বাচনে প্রার্থী করেছিলেন। তাঁরা দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশন চলাকালে 'গিরগিটি' নাটকটি অভিনয় করবেন। সারা দেশের জনপ্রতিনিধিদের সামনে বামপন্থীদের মুখোশ খুলে দেবেন টালিগঞ্জের তারকারা। সিপিএমের রং পালটানোর খেলাটার পর্দা ফাঁস করা হবে।

'গিরগিটি' নাটকটির রচনা ও সংলাপ দিদির। নাটকটির শেষে একটি মাত্র কোরাস গান আছে। সুর দিয়েছেন দিদির দুই তাল বেতাল অনুচর মুকুল-বকুল। এই দায়িত্বটা পাওয়ার কথা ছিল দলের দুই আইনজীবী লালু ভুলুর। তাঁরাও আশায় ছিলেন। কারণ নরেন্দ্র মোদীজীর শপথের পর চায়ের আসরে ছটা রসোগোল্লা আর চারটে সিঙাড়া খেয়ে দিদির মান ইজ্জত নষ্ট করার অভিযোগে মুকুল-বকুলের আর সুরকার হওয়া হবে না। কিন্তু সারদা রহস্য ফাঁস করার জুজু দেখিয়ে মুকুল-বকুল বাজি মেরে দিল। দিদির 'গিরগিটি' নাটকের সংলাপ ও কোরাস গানটিকে নিয়ে কলকাতায় নানা গুজব রটেছে। শোনা যাচ্ছে যে নাটকের কোরাস গানে কমপক্ষে ছ'বার কানচাপাটি কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। আর কোরাস গানে বাংলার নিজস্ব কীর্তনের সুর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'দেব না দেব না/ আমরা আর কানচাপাটি দেব না দেব না।' সুরটা নাকি বাংলাদেশের একটি চলচ্চিত্র থেকে আগাগোড়া ঝাড়া। মুকুল-বকুলের বক্তব্য, বাংলাদেশের সুরতো এপার বাংলার মানুষ শোনার সুযোগ পায় না। আমরা সেই অধরা সুরই লোকসভার নাট্যমঞ্চে দেশের জনপ্রতিনিধিদের দিতে চেয়েছি। বিশেষ সূত্রে খবর, সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। তবে তারিখ ও সময় এখনও স্থির হয়নি।

জিতেও গোহারা দিদিভাই

প্রিয় পাঠক,

জয় করে তবু ভয় কেন তাঁর যায় না...। রবি ঠাকুরের সেই গানটা বড় মনে পড়ছে। এমন দারুন ফল করেও তৃণমূলনেত্রী কেমন যেন মনমরা। এমন ফল আগে কখনও হয়নি। ৪২-এ ৩৪। ভাবা যায়! কিন্তু মানতে পারছেন না দিদি। যেবার রাজ্যে মাত্র একটি আসনে ঠেকেছিল তৃণমূল কংগ্রেস, তিনি নিজে ছাড়া কাউকে জিতিয়ে আনতে পারেননি সেবারও এতটা ভেঙে পড়েননি মমতা। কিন্তু এবারের ফল তিনি একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না। খুব হতাশ।

আসলে তিনি তো এবার শুধু ভাল ফল করতে চাননি, চেয়েছিলেন কেন্দ্রের সরকার গঠনের নিয়ন্ত্রক হতে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে এ কি হল! শেষে কিনা হরিদাস পাল নরেন্দ্র মোদীই প্রধানমন্ত্রী! এটাকেই মনে হয় ঘোর কলি বলে। ভাবছেন তৃণমূলের দিদি। কেন্দ্রে জোট সরকারের জমানাই তো তাঁর উত্থানের কারণ। আর সব সময় অস্থিরতা ভালবাসেন তিনি। একটা সরকার গঠন হলো অথচ কেউ তাঁর মুখাপেক্ষী হলো না? এও সম্ভব!

সেই যবে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান তখন থেকেই তো জোট রাজনীতির উত্থান। আর জোট বাঁধা আর জোট ভাঙার খেলায় তিনি বরাবর বড় ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। কখনও স্বার্থের টানে বিজেপি-র হাত ধরেছেন, আবার কখনও দরকার মতো কংগ্রেসের হাত ধরেছেন। একদিন যে কংগ্রেসের সঙ্গে বিবাদ করে দল ছেড়েছিলেন, অবলীলায় ক'দিন আগে পর্যন্তও হাত ধরাধরি করে ভোটে জিতেছেন। তিনিই ভারতের সেই সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিকদের অন্যতম যাঁরা দরকার মতো এনডিএ-তেও গেছেন আবার ইউপিএ-তেও গেছেন। এবং উভয় সরকারকে বিপদে ফেলে অস্থিরতা তৈরি করেছেন। দর কষাকষি করে আখের গুছিয়েছেন। দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এর মধ্যে কুশলী রাজনীতি থাকলেও রাজনৈতিক কুশলতা নেই। বরাবর রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে নিজের এবং নিজের দলের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন। আর প্রত্যেকবারই জোটের প্রধান দলের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সব শেষে তাঁর পদত্যাগ হাঁফ ছাড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন প্রধান দলের নেতাদের। সেটা কখনও বিজেপি কখনও কংগ্রেস।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ভুক্তোভোগী বিজেপি এবার তাই প্রথম থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। মমতাই বরং আগ বাড়িয়ে আমি যাব না, জোট করব না জাতীয় সংলাপ আউড়ে গেছেন সেই কবে থেকে। মুখে না বললেও মনে মনে স্বপ্ন ছিল এবারেও একটুর জন্য আটকে যাবে বিজেপি আর তার কাছে হাত পাতবে সমর্থনের জন্য। ফের দর কষাকষি করে আখের গুছিয়ে নেবেন। গত ইউপিএ সরকারের সেই দিনগুলো এখনও নিশ্চয়ই পাঠকের মনে আছে। রেল বাজেট পেশ করলেন দীনেশ ত্রিবেদী। কিন্তু দলনেত্রীর পছন্দ হল না। সঙ্গে সঙ্গে দীনেশকে সরিয়ে মুকুলকে অভিষিক্ত করার জেদ ধরলেন। কোনওরকমে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসের কোনও উপায় ছিল না। মনমোহন সিং-কে তাই মেনে নিতে হলো। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করে একই বছরে কয়েকদিনের ব্যবধানে একই সরকারের একই দলের দু'জন রেলমন্ত্রী দু'রকম বাজেট পেশ করলেন। তারপরও কংগ্রেসের সঙ্গে বনিবনা টিকে গেল। কারণ কংগ্রেস কেন্দ্রে টিকে থাকার জন্য খুব একটা রাগ দেখাতে পারল না। মমতা কিন্তু তখন চাইছিলেন জোট ভেঙে বেরিয়ে আসতে। কারণ, ততক্ষণে কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্যতার প্রয়োজন মিটে গেছে তাঁর। বিধানসভা জয়ের মোক্ষ লাভ হয়ে গেছে কংগ্রেসের হাত ধরে। নানা ছুতো খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ইউপিএ টু জনবিরোধী বলে সরকার থেকে বেরিয়ে এলেন। ভাবটা এমন যেন আগে তাঁর সেটা জানা ছিল না।

এবার লোকসভা ভোটের আগেই মমতা জানতেন যে কংগ্রেস আর ফিরবে না। উল্টোদিকে বিজেপি যে শক্তিশালী হবে সেটাও জানতেন। কিন্তু এতটা শক্তি হবে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যাবে সেটা ভাবেননি। তাঁর স্বপ্ন ছিল কিছুটা কম থেকে যাবে ম্যাজিক ফিগার থেকে। আর সেটা হলেই নানা অজুহাতে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করবেন এবং বারবার দিল্লী গিয়ে হম্বিতম্বি করবেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্নটা যে যাই বলুক আমি জানি দিদি কখনওই দেখেননি। প্রথমদিকে ফেডারেল ফ্রন্ট বানিয়ে একটা কিছু করে ফেলার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেটা খুব তাড়াতাড়িই ভেঙে যায়। আর সেটার জন্যও দায়ী তিনিই। কারণ, বছরের পর বছর বিভিন্ন সরকারকে নাকে দড়ি দিয়ে খেলানোর যে ভাবমূর্তি তিনি নিজেই তৈরি করেছেন তাতে খুব বিপদে না পড়লে তাঁর সঙ্গে জোট বাঁধার মতো দল এই ভারতে নেই।

কংগ্রেস এখন গাড্ডায়। সুতরাং এখন একমাত্র সোনিয়া গান্ধীই হাত বাড়াতে পারেন। তবে এখনই বাড়াবেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। এসব কারণেই দিদির মন খারাপ। চাপ রাজনীতি চালানোর মতো ভাল শক্তি যখন এল তখনই কীনা খেলা থেকে বাদ পড়ে গেলেন তিনি। এখন আবার হরিদাস পালকেই 'পিএম, স্যার' বলে ডাকতে হবে। দূর ভাল্লাগে না!

— **সুন্দর মৌলিক**

এই জয়ের কান্ডারি কে?

দেবীপ্রসাদ রায়

গণতন্ত্রে জয়কে জনগণের জয়ই বলা হয়— সেই অর্থে নির্বাচনে জয় জনগণের, কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষিত, অনেক ধৈর্য, পরিশ্রম, দোষারোপ, দুঃখ কষ্টের, ঘাম ও রক্তের পথ পার হয়ে এই যে জয় অর্জিত হলো নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তার প্রকৃত কান্ডারি নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস।

ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি বৈদেশিক মুসলমান আক্রমণের সময় থেকেই একটার পর একটা আক্রমণে, তার নৃশংসতায়, শোষণে, ধর্মান্ধ প্রশাসনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে সর্বশেষ ইংরাজ কৌশলের চাপে এবং উত্তর স্বাধীনতাকালে পাশ্চাত্যাভিমুখী শাসকবর্গের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি অনুসরণ ও প্রয়োগের ফলে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও দৃঢ়প্রত্যয়ে সঙ্ঘ পরিচালনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সঙ্ঘপরিচালকদের নিরলস কর্মপ্রয়াসে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্বয়ংসেবক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রায় নীরবে নিঃশব্দে জাতির পুনর্গঠনের সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ আর এস এস। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে নয় পরন্তু ভারতের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে সুস্থ সবল পূর্ব ঐতিহ্যের সার্থক অধিকারী করে অখণ্ড ভারত গড়ে তোলার সাধনায় ব্যাপৃত আর এস এস। সেই নীরব সাধনার ফল এল সত্য প্রতিষ্ঠার পর আজ ৮৮ বছর পরে। এই জয়ের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্মাণ প্রয়াসের নিরলস সাধনায় একটু একটু করে বহু বাধাবিপত্তির মধ্যে স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে আর এস এস। সঙ্ঘ পরিচালকরা তাদের সাধনাকে বহুমাত্রিক বিস্তৃতির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পথনির্দেশ দিয়ে এসেছেন। বার বার অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও সফল উত্তরণ ঘটেছে নতুনতর উৎসাহে। কংগ্রেস সরকার জাতির অন্তরাত্মার কথা মর্মবেদনার কথা অনুভবে অপারগ থেকেছে বরাবর, ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছে আর এস এস-এর উপর। নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৭৫-৭৭, ১৯৯২ সালেও। সুকৌশলী প্রচারে তথাকথিত প্রগতিশীল সেকুলারদের সহায়তায় সর্বসাধারণের কাছে আর এস এস-কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু 'সত্যমেব জয়তে'— এই চিরন্তনী সত্যের প্রভাবে ,সমস্ত সংশয়ের জাল ছিন্ন করে আর এস এস-এর ভূমিকা মানুষের অন্তরে ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। তারই ফলশ্রুতি এই বিপুল জয়। হতাশাগ্রস্ত প্রগতিশীলরা এখনই উল্টো প্রচার শুরু করে দিয়েছে 'যে যার লঙ্কায় সে হয় রাবণ'-এর শ্লোগানের মাধ্যমে। আমরা, আমজনতা— আমাদের ঝুলিতে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার নিদর্শন আছে। তবুও প্রেক্ষিতটা একেবারে নতুন। তাই মনে প্রাণে চাই রাবণের পুনরভ্যুদয় যেন না হয়। সঙ্ঘের সতর্ক অভিভাবকত্বে নরেন্দ্র মোদীই ঠিক Model of Divine India-র রূপকার হতে পারবেন।

পুরনো কংগ্রেসীরা স্মৃতিরোমন্থনে বলছেন, গান্ধীজীর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী যদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পুনর্বিন্যস্ত হত যথাসময়ে ১২৮ বছরের কংগ্রেস এভাবে ভেঙে পড়ত না! কী ছিল গান্ধীজীর ইচ্ছাপত্রে? গান্ধীজীর মৃত্যুর একমাস আগে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস উপসমিতি গান্ধীজীর প্রস্তাবমতো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বর্তমান চেহারায় ও মানসিকতায় যে সাম্যানিক ন্যায় প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য তা দিতে অপারগ, তাই কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হলো। কংগ্রেস এখন লোক সেবক সঙ্ঘের রূপ পরিগ্রহ করুক। কিন্তু হঠাৎ গান্ধীজীর এ কথা কেন মনে হলো কংগ্রেসকে নিয়ে?

১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধার গান্ধী-আশ্রমের কাছেই আর এস এস-এর শিবির হয়েছিল ২৩।২৪।২৫ ডিসেম্বর। দূর থেকে সঙ্ঘের কার্যক্রমের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে গান্ধীজী কৌতূহলী হন এবং শিবিরে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৫ ডিসেম্বর তিনি শিবিরে এসে স্বয়ংসেবকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যক্রমে মুগ্ধ হন। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে যে গান্ধীজীর মাথায় কংগ্রেস ভেঙে লোক সেবক সঙ্ঘ (এল এস এস-র) করার প্রেরণা এসেছিল আর এস এস থেকেই।

কাজেই আজ যাঁরা অভ্যাসমতো অভিযোগ তোলেন আর এস এস-ই নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে— সেই অভিযোগ কি শংসাপত্রে পরিণত হচ্ছে না? কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা লালসা এবং ভবিষ্যতে তার পরিণতির কথা ভেবেই কৃপালনীর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পদত্যাগের পর গান্ধীজী সভাপতি মনোনয়ন/ নির্বাচনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে অগ্রাহ্য করেই স্বাধীনতার পর ক্ষমতাভোগের সমঝোতা অনুযায়ী রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করা হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্ষমতা ভোগ করার সূত্রেই দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও পরিবারতন্ত্রের অনুপ্রবেশ রাজনীতিতে আজ তারই বিষময় ফল ফলছে--- আমরা দেখছি। নতুন প্রেক্ষিতে দেশবাসীর আনন্দের মধ্যে এক আশঙ্কাও আছে। নেহরু বলেছিলেন কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন! কার্যত দেশবাসীই বাঁধা পড়েছিল!

আমাদের প্রত্যাশা আর এস এস-এর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে মোদীর নেতৃত্বে দেশের প্রথম প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী সরকার দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সফল হবে।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান)

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুত্ব উপাদান এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারতের জনগণ এবছর ২৬ জানুয়ারি উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে, ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত নিজস্ব সংবিধানের ৬৫তম জয়ন্তী পালন করেছে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা সকলেই আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস ও সংবিধানের জন্য গর্বিত। কিন্তু কখনোই আমরা এই সংবিধানে সন্নিবেশিত হিন্দু উপাদান এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার বিষয়বিন্দুসমূহ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হই না।

সাংস্কৃতিক ঐক্যের এই অনুপম ভূমি যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল তা কখনোই স্বাধীনতাকামী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে অভিপ্রেত ছিল না। মুসলমান জনসমুদয়ের তথা স্বার্থপর কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্বের চক্রান্তে তরবারির জোরে ও বৃটিশের 'বিভাজন কর ও শাসন কর'— এই ধূর্ত-নীতির অশুভ চক্রান্তে সংখ্যালঘু মুসলমানরা পাকিস্তান হাসিল করেছিল।

দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য স্বল্প প্রয়াসে ও ন্যূনতম রক্ত ঝরিয়ে মুসলমান চক্রান্তকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে যখন 'ইসলামিক পাকিস্তান' হাসিল করেছিল, তখন দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্বাধিক আত্মবলিদানকারী হিন্দুরা কিন্তু 'হিন্দু ভারত' পায়নি। বিপরীতপক্ষে, যে মুসলিম লীগ ভারত বিভাজনের জন্য এক ভয়ঙ্কর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই মুসলিম লীগের বহু সদস্য এবং সমর্থক ভারতবর্ষে থেকে যায়। যারা কখনোই অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দেয়নি, যথেষ্ট দেশপ্রেমিক হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' -এর ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়নি, তারা ভারতবর্ষে থেকে গিয়ে এই দেশকে আবার এক বিভাজনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কাশ্মীর থেকে কেরল, মুজফ্‌ফরনগর থেকে হায়দরাবাদ, অসম থেকে গুজরাট সর্বত্র এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিকে কণ্ঠরুদ্ধ করতে ছদ্মবেশী বহু পাকিস্তানি প্রতিনিধি ভারতের

সংবিধান সভা ও সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী সমিতির মধ্যে থেকে ভারতীয় সংবিধানকে একটি হিন্দুবিরোধী সংবিধানরূপে প্রস্তুত করার কুপ্রয়াস চালিয়েছে।

ছদ্মনিরপেক্ষতাবাদী, আরবীয় সংস্কৃতির প্রচারক এবং সুপরিচিত মুসলিম লীগের বহু নেতাই সংবিধানসভা ও খসড়া সমিতিতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। লিয়াকৎ আলি খান, ফিরোজ খাঁ নুন, শহিদ সোরাবর্দী, জাফরুল্লা খান, মহম্মদ সাদাউল্লা প্রমুখ ভারতীয় সংবিধান রচনার সুযোগ পেয়ে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ও হিন্দুত্বনিষ্ঠ সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে মুসলিম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে পাকিস্তান হাসিল করেছিল, সেই সমস্ত অনেক সাম্প্রদায়িক নেতার হাতেই খণ্ডিত ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বিতর্কিত ভূমিকাকে অনুল্লেখিত করতে পারি না এই কারণে যেহেতু তিনিও নিঃশব্দে ভারতের সংবিধানকে হিন্দু অনপেক্ষ রূপে রচনার ক্ষেত্রে এক রহস্যময় ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাকিস্তানের অন্যতম প্রবক্তা কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমেদের পাকিস্তান তত্ত্বের নীরব সমর্থনে মৌলানা আজাদ পাকিস্তান বিরোধিতার বিপক্ষে আন্তরিক ভাবে সোচ্চার হননি। আর 'পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'— এই দাবি তুলে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, ভারতের ঐক্য সাধনাকে আঘাত করে বিচ্ছিন্নতার পালে হাওয়া যুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড ভারত রচনার বিপক্ষবাদী কংগ্রেস- কমিউনিস্ট-মুসলমান ও সঙ্কর নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগের হর্তাকর্তারা, ভারত ভাগ সম্পন্ন করে, ভারতের সংবিধান রচনায় হাত লাগিয়েছিলেন।

একমাত্র ঈশ্বরই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণকে এক্ষেত্রে রক্ষা করেছিলেন। কমপক্ষে তিনজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী এবং বলিষ্ঠ হিন্দু নেতৃত্ব ভারতীয় সংবিধানকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরার অনুকূলে রচনার জন্য তাঁদের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের বলিষ্ঠ প্রয়াসে সাম্প্রদায়িক চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করে

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রুচি, সংবেদনশীলতা ও পরস্পরকে সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন।

সংবিধানের ৪৯ ধারায় যেমন গো-হত্যা নিরোধের প্রস্তাবটিকে স্বীকার করা হয়েছিল তেমনই সংবিধানে নিহিত অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি অথবা রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যান্য বিষয়ে এই প্রাচীন ভূমির পরম্পরা,

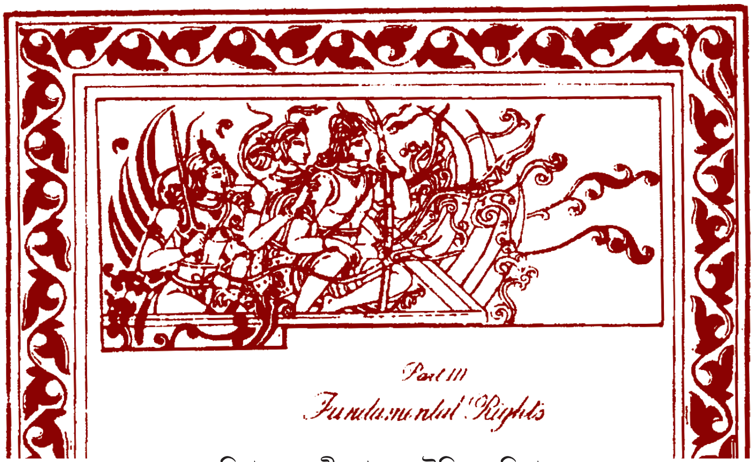

সংবিধানের তৃতীয় খণ্ড : মৌলিক অধিকারসমূহ— রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অযোধ্যায় ফেরার ছবি।

হিন্দুমূল্যবোধ সর্বোপরি ভারতীয় সহাবস্থানের চিরন্তন আদর্শবাদকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এই উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গৃহীত এই সংবিধানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবসময় তাঁরা শরিয়তি গোঁড়ামিকে ও খৃস্টীয় অসামঞ্জস্য পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংবিধান রচনার এই আদর্শকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (যাঁর ধর্মান্তরিত নাম মাইমুনা বেগম এবং যিনি ফিরোজ খাঁর মুসলমানী পত্নী ছিলেন) স্বৈরতান্ত্রিকভাবে কলঙ্কিত জরুরি অবস্থার মধ্যে ১৯৭৭ সালে, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'অপরিবর্তনীয়' সাংবিধানিক প্রস্তাবনার মধ্যে 'সমাজবাদী' ও ধর্মনিরপেক্ষ' এই দুটি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবনাকেই ধ্বংস করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক রুশীয় শক্তি ও জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কমিউনিস্টদের খুশি করতে ইন্দিরা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক (সোসালিস্ট)' শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটান। আবার ভারতীয় সংবিধান যাতে হিন্দু অধিকার ও সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে একটি অচল পয়সায় পরিণত হয় সেজন্যে তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে খুশি করতেই, 'ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার)' শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তিনি ধর্মীয় সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা, কিছু রাজ্যের বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং সর্বোপরি ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর সাম্প্রদায়িক দাবি-দাওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেন।

বাংলায় সংবাদজগতের শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ সাংবাদিক প্রয়াত পবিত্র কুমার ঘোষ— এই নিবন্ধকারকে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, তৎকালীন সাম্প্রদায়িক শক্তি ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের চাপে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সংবিধানের মূল গ্রন্থ থেকে কিছু হিন্দুচিত্র অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বড়সড় প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমত গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া খবর পেয়ে, সেই পর্যায়ে ওই চিত্রগুলি অপসারণ করতে তিনি নিরস্ত হয়েছিলেন।

সংবিধানের বেশিরভাগ পাঠক, রাজনীতি ও সমাজনীতির ছাত্র-ছাত্রী ও সংবিধান বিষয়ে আগ্রহী মানুষজন আদৌ ভারতীয় সংবিধানের হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না। এই সংবিধানের শিল্পলিপি প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়াজদা কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। তাঁর সংবিধানের প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে অনুপম চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছিলেন শান্তিনিকেতনের কিংবদন্তী শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও তাঁর কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। সংবিধান গ্রন্থের পলিলিথোগ্রাফ মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছিলেন যথাক্রমে ভারতীয় সর্বেক্ষণ সংস্থা ও দেরাদুন জাতীয় সংগ্রহশালা। ভারতীয় সংসদে হিলিয়াম বাক্সের মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের মূল গ্রন্থটি সংরক্ষিত রয়েছে। মূল সংবিধানের প্রচ্ছদ ও প্রতি পাতার কিনারা, শেষ প্রচ্ছদে ও প্রারম্ভিক অশোকস্তম্ভ ছাড়া আরও ২২টি চিত্র সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি তথা বৈদিক ও হিন্দু জীবনের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত এই বাইশটি চিত্রে ভারতীয় সংবিধানের মূল ভাবধারাটি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সংবিধানের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রাসঙ্গিক এই চিত্রাবলী সংবিধানের মাধ্যমে সুনিশ্চিত অধিকার, দায়িত্ববোধ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, সুরক্ষা, জনকল্যাণ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ভারতীয় পরম্পরায় অনুপ্রাণিতকরণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই চিত্রগুলি ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের এক মূর্ত বহিঃপ্রকাশ যা ভারতের চিরন্তন হিন্দু জীবনচর্যা ও মূল্যবোধকে সুস্পষ্ট করেছে।

সংবিধান পাঠের শুরুতে 'সত্যমেব জয়তে' সম্বলিত অশোক স্তম্ভের সুদৃশ্য অলঙ্করণ রয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের বাইশটি চিত্রে শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিক লঙ্কাবিজয় ও সীতা উদ্ধার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশের চিরন্তন সত্য, বৈদিক জীবনের যাগযজ্ঞ, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, সম্রাট বিক্রমাদিত্য, গৌতমবুদ্ধ, তীর্থঙ্কর মহাবীর, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, রানী লক্ষ্মীবাঈ, হিমালয়, মরুভূমি ও মহাসাগরের বিভিন্ন দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে।

সংবিধানের প্রথম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে মহেঞ্জোদড়োর অবিস্মরণীয় বৃষমূর্তির সিলমোহর দিয়ে। ভারতীয় জনজীবনে বৃষভ পূজা ও কৃষিক্ষেত্রে গো-সম্পদের ব্যবহারের

গুরুত্ব এই চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাগরিকত্ব বিষয়ক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে ভারতীয় বৈদিক পরম্পরার চিত্র দিয়ে। মৌলিক অধিকার সম্বলিত তৃতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে আসুরিক শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকারী লঙ্কাবিজয়ের চিত্রের দ্বারা। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি সম্বলিত চতুর্থ অধ্যায় শুরু হয়েছে কর্মযোগের প্রাধান্যে ধর্ম-রাজ্যের সংস্থাপনার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতা উপদেশের চিত্রের মাধ্যমে। রাজ্য-সঙ্ঘ সম্বলিত পঞ্চম পরিচ্ছদ শুরু হয়েছে ভগবান বুদ্ধের সঙ্ঘ প্রবর্তনের চিত্রের মাধ্যমে। প্রথম অংশে সংযুক্ত রাজ্যগুলির বিষয় সম্বন্ধিত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে তীর্থঙ্কর মহাবীরের চিত্রের মাধ্যমে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে ভগবান নটরাজের নৃত্যরত চিত্র। এছাড়াও বিক্রমাদিত্যের চিত্র, গুপ্ত ও ওড়িয়া ভাস্কর্যের চিত্র, হিমালয়, মরুভূমি, সাগর ইত্যাদি বিবিধ চিত্র, ভারতবর্ষের সনাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূর্ত প্রতিফলন যা ভারতীয় সংবিধান ও জনজীবনকে চিরকাল প্রভাবিত করে এসেছে।

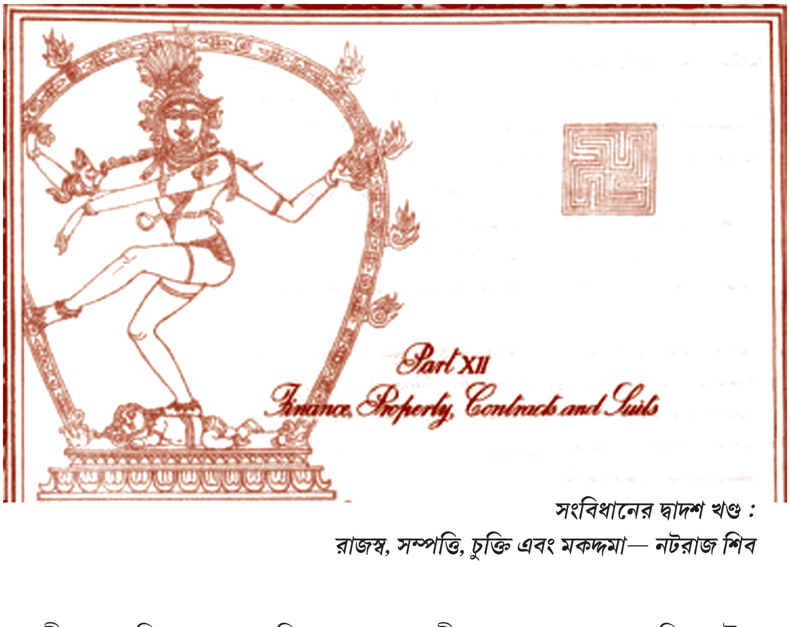

সংবিধানের দ্বাদশ খণ্ড : রাজস্ব, সম্পত্তি, চুক্তি এবং মকদ্দমা— নটরাজ শিব

স্বাধীনতা সংগ্রামের সমকালীন দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবিও ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে। তাঁরা হলেন— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধীর দুটি চিত্র রয়েছে—একটি ডাণ্ডি অভিযানের ও দ্বিতীয়টি ইসলামিক বর্বরতায় আক্রান্ত নোয়াখালি হিন্দুনিধনের পর সেখানে গান্ধীজীর পরিদর্শনের চিত্র। আর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতেই বহির্ভারত থেকে যুদ্ধরত অবস্থায় ভারতবর্ষকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে নেতাজীর একটি সুদৃশ্য চিত্রও সংবিধানে স্থান পেয়েছে।

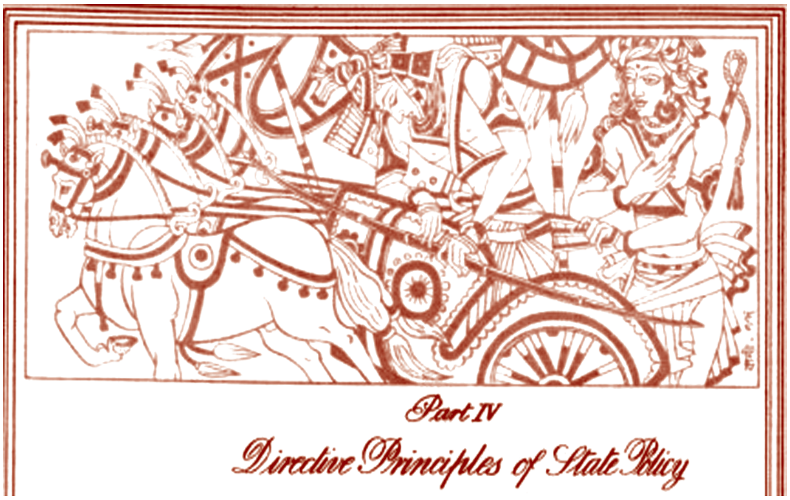

সংবিধানের চতুর্থ খণ্ড : রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহ— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন।

মাত্র দুজন মুসলমান রাজপুরুষের ছবি সংবিধানে স্থান পেয়েছে। একজন— সম্রাট আকবর ও দ্বিতীয়জন— টিপু সুলতান। এর মধ্যে রাজপুত শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে প্রতিবাদী হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থানকে নিমজ্জিত করার জন্য আকবর ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দু নিধনের জন্য টিপু সুলতানের ন্যক্কারজনক ভূমিকা বরাবরই ভারতীয় ইতিহাসে সবসময় বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। আকবর ও টিপু সুলতান আরবীয় ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। আরবীয় ধর্মমত সদাসর্বদা আগ্রাসী ও অন্য মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত। সংবিধানে তাদের চিত্রের সমাবেশ ভারতীয় সংবিধানে আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এছাড়া সংবিধানে অঙ্কিত সমস্ত চিত্র সম্পূর্ণ ভারত দ্যোতনায় ভাস্বর, একশত ভাগ সনাতনী।

কোনোভাবেই জাতীয়তাবাদী সংবিধান প্রণেতাদের শুভপ্রচেষ্টা তথা সংবিধানে ভারতীয় ইতিহাসের অপূর্ব চিত্রায়ণ এই সংবিধানকে কখনোই হিন্দুত্ববিরোধী করে তুলতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব তথা এর মধ্যে নিহিত হিন্দুত্ব উপাদানগুলিকে অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটিত করা অত্যন্ত জরুরি।

সংস্কৃতি ও সন্ত্রাস

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি শব্দটির পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত হলেও সংক্ষেপে বলা চলে কোনও স্থানে দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতি ও মানুষের মানুষের অন্তঃক্রিয়ার ফলে যে এক আদর্শ জীবন শৈলী গড়ে ওঠে তাকে সেই স্থানের সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতির অন্তর্গত সেখানকার মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা, শিল্পকলা, রুচি, রীতি-নীতি, ধর্মাধর্ম বোধ ইত্যাদি।

প্রকৃতিই সংস্কৃতির সর্বপ্রধান স্রষ্টা ও এই জন্যই স্থানভেদে সংস্কৃতি এত বিভিন্ন প্রকারের। প্রাকৃতিক বিভিন্নতার কারণেই যে আচরণ এক সমাজে নিন্দনীয় বা দোষাবহ অন্য সমাজের সংস্কৃতিতে তা গ্রাহ্য।

হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্যাবর্ত অংশে উদার প্রকৃতির কোলে এক অনাত্মপরায়ণ সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। সেই সংস্কৃতিই ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হিসাবে মান্যতা পায়। এই বিশাল ভূখণ্ডে স্থানীয়ভাবে অশন-বসনের প্রভেদ থাকলেও সামগ্রিকভাবে মনন ও চিন্তনের জগতে সবাই একাত্ম ছিল। এখানে মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজের স্বার্থের গণ্ডীর বাইরে সমগ্র জগতের জন্য, সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ও কাজ করত। সেই সংস্কৃতির বর্তমান ধারক ও বাহকেরা আজও মন্ত্রোচ্চারণ করে 'সর্বে সুখীনঃ ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ।।' সকলের জন্য কল্যাণ ও নিজে যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয় তার প্রার্থনা করে। আজও তারা সকল পূজার্চ্চনার শেষে শান্তিমন্ত্রে আকাশ, জল, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, বনস্পতি, ওষধির সঙ্গে সর্বত্র সকলের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। বিশ্বের সর্বত্র গুণীজনেরা স্বীকার করেন পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, শোষণহীন বিশ্বের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির শরণে আসা ছাড়া অন্য গতি নেই। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ আজ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা নামের রাজনৈতিক পরিচয় পেয়েছে। সেই সাংস্কৃতিক একাত্মতাও বহু ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়েছে। সেই সংস্কৃতির উৎসস্থলেই আজ ভিন্ন মানসিকতার মানুষেরা সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তুর জীবন যাপন করছে।

একদা খণ্ডিত ভারতবর্ষ প্রায় সাত দশক আগে আবার ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি দেশ হয়। আরও কিছুকাল পরে পাকিস্তান ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ভাষাও সংস্কৃতিরই অঙ্গ এবং ভাষার ভিত্তিতে দেশভাগ হওয়ার উদাহরণ বাংলাদেশের উৎপত্তি।

নানা ধর্ম, জাতি ও ভাষাভাষীর ভারতীয় জনসমাজের সিংহভাগ সনাতনপন্থী হিন্দু। অন্য দুটি দেশ মুসলমান প্রধান। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইসলামীয়। দেশ বিভাগের সময় ভারতে হিন্দু জনসংখ্যার যে শতকরা অংশ ছিল গত ছেষট্টি বছরে তা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে এই দেশের মুসলমান জনসংখ্যা শতাংশের নিরিখে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় সীমান্তের দুই পারে ইসলামীয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমতে কমতে আজ প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথে, অপরদিকে সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা শতাংশ হিসাবে প্রায় পূর্ণতার কাছে পৌঁছে গেছে। যে মৌলিক কারণে এই তিন দেশের জনসংখ্যার এমন বিপরীত হ্রাস- বৃদ্ধি হয়েছে তার মূলে রয়েছে দেশগুলির সংস্কৃতি। এক দেশে উদার ও সহনশীল মানুষ অন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, অপরদিকে নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য দুটি দেশের মানুষ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব মুছে দিতে তৎপর।

জন্মলগ্ন থেকে ভারতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন চলছে। অপরদিকে ইসলাম গণতন্ত্র না মানায় অন্য দুই দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ পদে পদে বাধা পেয়েছে। সেসব দেশে কখনও স্বৈরতন্ত্রী শাসন, কখনও সেনাবাহিনীর শাসনের ফাঁকে গণতন্ত্র বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পাকিস্তানে তালিবানিরা শরিয়তি শাসনের পক্ষে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। তেহরী-ই নিফাজ-ই শরীয়াহ্ মুহম্মদী-র প্রধান সুফী মুহম্মদ ঘোষণা করেছেন— ইসলাম গণতন্ত্র অনুমোদন করে না ও পাকিস্তানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ভুল।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিভাজন-পূর্ব ভারতবর্ষ হাজার বছর ধরে বিজাতীয় মানুষের অধীনে থেকে চরম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদল যেমন শাসকদের কাছে নতি স্বীকার করে নিজের সনাতনধর্ম ত্যাগ করেছে তেমনই অধিকাংশ মানুষ নির্যাতন সহ্য করেও স্বধর্ম ত্যাগ করেনি। প্রাণ দিয়েছে কিন্তু নিজের সংস্কৃতি ছাড়েনি। তারা যুগ যুগ ধরে জিজিয়া কর দিয়েছে, তাদের ঘর-বাড়ি, দেবস্থান ধ্বংস হতে দেখেছে, বাড়ির স্ত্রী-কন্যা, ভগ্নীর নারীত্ব লুণ্ঠিত হয়ে গেছে তবু তারা প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে স্থির থেকেছে। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ও উন্নত সংস্কৃতির ধারা সেই সব মানুষগুলির জন্যই আজও প্রবহমানতা হারায়নি। সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা আজও এই ভারতেরই অধিকাংশ মানুষ। আজও তারা সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে এবং কোনও কিছুর বিনিময়েই হত্যা ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না।

যারা নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেনি তাদের কাহিনী ঠিক এর বিপরীত। সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করার প্রার্থনা তারা ভুলে গেছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষের সেই সুমহান সংস্কৃতিকে অন্তরের গভীরে অচেতন মনে নির্বাসিত করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অবচেতনে তা স্থান পেয়েছে এবং আরও কম হাতে গোনা যায় এমন সংখ্যক মানুষ ধর্ম ত্যাগের পরও নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে চেতন মনের জগতে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। মধ্যযুগের কবীর, মহম্মদ জায়সী, পাঠান বংশের রসখান ও অব্দুর রহীম খান খানান প্রমুখ এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ওতপ্রোত হয়ে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। আধুনিক

যুগে রয়েছেন মুহম্মদ ইকবাল ও বাংলা সাহিত্যের নজরুল ইসলাম। রয়েছেন সবরঙ্গ (বড়ে গুলাম আলি খাঁ), ভারতরত্ন এ পি জে আব্দুল কালাম। পিতৃপিতামহের সাংস্কৃতিক উন্মূলন এঁদের স্পর্শ করেনি। তাঁরা দেশের সংস্কৃতি থেকে রস আহরণ করে নিজেদের পুষ্ট করেছেন, তৃপ্ত হয়েছেন ও নিজেদের সৃষ্টি দিয়ে অন্যকে তৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করার রসদ রেখে গেছেন। এ হলো আলোকিত দিকের কথা। এঁরা ধর্মমতে ভিন্ন হলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিজেদের যুক্ত করে রেখেছেন ও রেখেছিলেন। যেমন রেখেছে ভারত ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া নিজের নামের মধ্যে ভারতকে ধরে রেখেছে। এ যেন ভারতের সীমার বাইরে এশিয়া মহাদেশে আরেক ভারত বা মহাভারতের অংশ।

ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র। ১৩৬৬৭টি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশে ছয় হাজারেরও বেশি দ্বীপে জনবসতি আছে। বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কালিমান্তান প্রধান দ্বীপ। এই দ্বীপ- রাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ মুসলমান ১০ শতাংশ খৃস্টান এবং দুই শতাংশ হিন্দু। সেখানকার অধিবাসীরা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তাঁরা ধর্মমত পরিবর্তিত করেছেন কিন্তু নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হননি। তাই নৃত্যগীত সেখানে নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি ও সেখানকার তরুণ তরুণীরা ধর্মমত নির্বিশেষে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে শেখে। সেখানে আজও বাবা-মায়েরা কন্যা সন্তানের নাম রত্নাবতী, মেঘাবতী (সুকর্ণপুত্রী) ও ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের নামানুসারে রাখেন। সেখানে জাতীয় সড়কপরিবহণের নাম 'রামায়ণ ট্রান্সপোর্ট' ও বিমান পরিবহনের নাম 'গরুড়'। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর প্রতীকচিহ্ন 'হনুমান'। স্থানীয় এলাকার নাম মিত্র আবাদী, সন্তুষ্টি আবাদী, আশিস গৃহ ইত্যাদি। সেখানে কুড়ি হাজার টাকার নোটে রয়েছে গণেশের ছবি। বড় বড় মঞ্চে ও হোটেলে নিত্য অনুষ্ঠিত হয় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী আশ্রিত নৃত্য। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা শহরের মাঝখানে একটি প্রসিদ্ধ স্থাপত্য রথারূঢ় অর্জুন ও পার্থসারথি কৃষ্ণের। বালিদ্বীপের রাজধানী দেনপাসারে রয়েছে যুদ্ধরত ভীমের মূর্তি ও Ngurah Rai. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশ পথের মুখে রয়েছে ঘটোৎকচের বিশালাকার মূর্তি। আমরা ভারতে ভাবতেও পারি না ইন্দোনেশিয়ার মতো এমন প্রকাশ্যে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করার কথা। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে সমাজজীবন থেকে বেদ-পুরাণের জ্ঞান, উপদেশ ত্যাগ করেছি। সংস্কৃত শিক্ষা করলে যদি বৈদিক নীতি সহজবোধ্য হয় তাই ছলে-বলে-কৌশলে সংস্কৃতকে ত্যাগ করেছি। নিজেদের গৃহকোণের নিভৃতে এগুলির চর্চা কেউ কেউ বাঁচিয়ে রাখলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবন থেকে তাদের বিদেয় করেছি। এর ফল চোখে দেখলেও মনে রেখাপাত করছে খুব কম লোকেরই। আজ দেশে-বিদেশে যেখানে যত সন্ত্রাস, হত্যা ও নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে তাতে এই উপমহাদেশের লোকেদের নিবিড় যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাচ্ছে। এই মানুষগুলির মধ্যে আবার তারাই প্রধান যারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ও হারিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র কিন্তু বিশ্ব সন্ত্রাসে তাদের লোকেরা যুক্ত নেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সন্ত্রাস এবং ধর্মমত পরস্পর সম্বন্ধিত নয়। বোঝা যাচ্ছে সন্ত্রাসে লিপ্ত হচ্ছে তারাই যারা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্মূলিত। আমরা এই সন্ত্রাস দেখেছি ব্রাহ্মণ সন্তান রাজুতে (কালাপাহাড়), ইসলামপন্থী হওয়ার পরে। আজও এমন শত শত কালাপাহাড়কে প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাই। আমরা চোখের সামনে দেখেছি নিজেদের সাংস্কৃতিক গৌরব বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিকে কীভাবে আফগানিস্তানের উপগণেরা ভেঙে ফেলেছে এবং কিভাবে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তারা সামগ্রিক বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। আবার এও দেখেছি যবদ্বীপের কেলুড আগ্নেয় পর্বতের উদ্গারিত ভস্ম থেকে বোরোবুদুরের মন্দিরগুলি রক্ষা করার জন্য ইন্দোনেশিয় সরকার কিভাবে মন্দিরসহ সমগ্র চত্বরটিকে প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। এই দুই দেশেরই মানুষ ধর্মীয় ভাবের বিচারে অভিন্ন কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একদল বলিষ্ঠ ও অন্যদল দেউলিয়া। তাবৎ বিশ্বের অধিকাংশ মতলববাজ মানুষ চায় অন্যকে দেউলিয়া, দুর্বলরূপেই দেখতে। তার ফলে চোখ খুলে দেবার কেউ নেই, সবাই চায় অন্ধত্ব চিরস্থায়ী করতে। ইকবাল দেশবাসীকে সতর্ক করে যে বাণী লিখে গেছেন তা অরণ্যেরোদন হয়েই রইল।

''ওয়তন কী ফিক্র কর নাদান (মূর্খ, দেশের চিন্তা কর)
মুসীবত আনেওয়ালী হ্যায় তেরী বরবাদীয়োঁ কে
মশ্‌বরে হ্যায় আসমানোঁ মেঁ
(অন্তরীক্ষে তোমাদের ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে)
ন সমঝোঁগে তো মিটজাওগে এ্যায় হিন্দোস্তাঁ ওয়ালোঁ
(ওহে হিন্দুস্তানের লোকেরা—না বোঝো যদি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে)
তুমহারী দাস্তাঁ তক ভী ন হোগী দাস্তানোঁ মেঁ।।
(তোমার কাহিনী থাকবে না কোনও গল্প কথাতেও)

ইকবালের এই বাণী কাউকে জাগিয়ে তুলতে শোনানো হয় না। উল্টে তাকে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রবক্তা হিসাবে প্রচার করা হয় ও দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাঁর লেখা 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'— দেশবন্দনার প্রথম দুই চার কলিই প্রচার পায়। সেই 'তরানা-ই হিন্দ'-এরই শেষের দিকের চেতনা ফেরানোর কথাগুলি লোকে জানেও না। জানানোর আগ্রহও নেই কোনও তরফে। তাই

''য়ুনান-ব মিশ্র-ব-রুমা, সব মিট গয়ে জহাঁ সে—
অবতক মগর হ্যায় বাকী নাম-ব-নিশাঁ হমারা।
কুছ বাত হ্যায় কি হস্তী মিটতী নহী হমারী—
সদীয়োঁ রহা হ্যায় দুশমন দৌর-এ-রশ্মে জমাঁ হমারা।।''

অক্ষরিক অনুবাদ— (গ্রীস, মিশর ও রোম, সব মুছে গেছে পৃথিবী থেকে— তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি লুপ্ত হয়েছে। এখনও কিন্তু বাকি আছে নাম ও চিহ্ন আমাদের। কিছু কথা আছে যে অস্তিত্ব মুছে যায়নি, আমাদের শত শত বর্ষ ধরে রয়ে গেছে আমাদের সংস্কারের পরম্পরা।)

ইকবালের লেখা এই পংক্তিগুলির প্রচার নেই। লোকে চায় না অস্তিত্ব রক্ষাকারী প্রাচীন সংস্কারের পরম্পরা বহন করে সবাই চলুক। বিভেদ সৃষ্টিকারী সমস্ত শক্তি গুলিকেই উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায় সর্বস্তরে। যে শিক্ষাব্যবস্থা সবার সঙ্গে এক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে দূরে ঠেলে রেখে কূপমণ্ডুকতা জীইয়ে রাখতে সেই মাদ্রাসা, মৌলবী, ইমামদের প্রভাব শক্ত করা, ভাষা তাদের আলাদা— উর্দু বুঝিয়ে সেইদিকে তাদের ঠেলে দেওয়া— এই চলছে আজ সর্বত্র। কেউ সত্য কথাটা বলে না যে নাস্তালীক লিপিতে লেখা হলেও ও আরবী-ফার্সী থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের বহুল প্রচলন থাকলেও উর্দু আসলে হিন্দীরই এক রূপ। কোনও ভাবেই এই ভাষার বাক্যগুলিতে সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদগুলি পরিবর্তিত করা যায় না। কেউ বলে না বর্তমান ভারতের সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান- বৌদ্ধ-খৃস্টান সকলেরই অবদানের ফলে। এই সংস্কৃতিই সবার নিজের, এতে সবার সমান অধিকার। এখানে কেউ উত্তমর্ণ বা কেউ অধমর্ণ নয়।

সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তুতা আজ মানুষকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে প্রত্যহ সংবাদপত্রে তার বহু খবর থাকে। মুসল্লম (অখণ্ড) ইমান (শ্রদ্ধা, আস্থা, ধর্মবিশ্বাস) দেয়নি এই ওজুহাতে শিয়াদের হত্যা চলছে। গণ সংহার চলছে আহমদীয় কাদিয়ানী ও বোহরা মুসলমানদেরও। আহমদীয়দের অপরাধ ইসলাম কবুল করেও তারা নিজেদের পূর্বের কুলপরিচয় ত্যাগ করেনি। মুহম্মদের সঙ্গে তারা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃস্ট, জরাথ্রুষ্ট ও কনফুসিয়াসকেও মহাপুরুষ হিসাবে গণ্য করে। এই অপরাধে নিজ স্বজাতীয় অন্যদের কাছে তাদের বেঁচে থাকার যোগ্যতা নেই ও সুপরিকল্পিত ভাবে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। হিংসার বলি এই নিরপরাধ মানুষগুলির পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। নিজের ধর্মের লোকেরা তাদের মারছে আর তাদের আদি পরিজনেরা নির্বিকার হয়ে সেই হত্যালীলা দেখছে। যারা মুসল্লম ইমান দিয়েছে, নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম, সংস্কৃতি সবই ত্যাগ করেছে তারা নিজেদের হিংস্র থেকে হিংস্রতর করে তোলার সাধনায় যেমন মগ্ন আছে তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। হাতবোমা, মানববোমার পর গণহত্যার জন্য তারা এখন নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহারের কথা ভাবছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ইয়াসিন ভাট্‌কল ধরা পড়ার পর তার স্বীকারোক্তিতে এমনি কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সুরাটকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য নিউক্লিয়ার বোমা আমাদের পাশের দেশ থেকে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে। বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতির বিন্দুমাত্রও আজ আর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এইসব পথভ্রষ্ট মানুষদের আরও দিশাহারা করে দেওয়ার খেলায় মেতে আছেন। এখানে অপরাধীর ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে অপরাধের বিচারের পক্ষে সওয়াল হচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের যে রায় তাদের নারীসমাজকে শক্তিশালী করতে পারত সেই শাহ্‌বানু মামলার রায় রাজনৈতিক স্বার্থে বাতিল করে দেওয়া হয়। তারা বোঝে না নিজেদের ঘরে ঘরে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে ও বোনেরা যে অনিশ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে তার দায় অন্য কারো নয় বরং তাদের নিজেদেরই।

আশার কথা, মুসলমান সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা ধীরে ধীরে সজাগ হচ্ছেন, নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। ভাষাকে আশ্রয় করে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি এরই ফল। পাকিস্তানেও জিয়ে সিন্ধ-এর প্রবক্তা জি. এম. সঈদের অনুগামীর সংখ্যা বাড়ছে যারা তাঁর অমর বাণীতে বিশ্বাস করে যে তারা পঞ্চাশ বছর যাবৎ পাকিস্তানি, পঁচিশ বছর যাবৎ মুসলমান কিন্তু পাঁচ হাজার বছর ধরে সিন্ধী। আমাদের দেশেও পণ্ডিত মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে যাঁরা নমাজ পড়েন নিষ্ঠার সঙ্গে আবার বেদ, উপনিষদের শ্লোকও কণ্ঠস্থ করেন। পণ্ডিত গুলাম দস্তগীর বিরাজদার (মুম্বই), পণ্ডিত মুফ্‌তি মুহম্মদ সারোয়ার ফারুখী (লখনউ), আশাব আলি (মহারাজগঞ্জ, ইউপি) ও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি এবং জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগের বহু মুসলমান পণ্ডিত এর উদাহরণ। ইন্দোনেশিয়ায় যেমন যোগশিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের উলেমা সভার (MUI) ফতোয়া বাতিল করে দেয় সেখানকার সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সংগঠন NAHDLATUL ULAMA (N.U.) এবং জনগণকে যোগাভ্যাস ও উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে গুলিয়ে না ফেলার পরামর্শ দেয়। আমাদের দেশেও দেওবন্দের অনুগামীরা যোগাভ্যাসের কল্যাণকর দিকটির উল্লেখ করে তা সবার অনুশীলন করলে ভালো বলে মত দিয়েছে। সেখানে অবশ্য ওম্ উচ্চারণের পরিবর্তে আল্লাহ বলতে বলা হয়েছে। আকাদেমী পুরস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত রসুল পুকুট্টি সম্প্রতি বলেছেন "I come from a country and a civilization that gave us the universal word. That word is preceded by silence, followed by more silence. That word is Om." এঁরা নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সগর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শিক্ষার প্রসার ও সংবাদমাধ্যমের সর্বত্রগামিতা সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলবেই। তাই আশা করা যায়, নিজের সংস্কৃতিকে যারা ভুলে বসে আছে আবার তারা তাকে নিজের করে নেবে এবং সেই সংস্কৃতির প্রভাবেই দার-উল-হরব নিশ্চিহ্ন করার ব্রত থেকে তারা নিরস্ত হবে, ফলে বিশ্বে সন্ত্রাস হ্রাস পাবে।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্তা অধ্যাপিকা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, যোগমায়া দেবী কলেজ)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

চিঠিপত্র

মিশন ১৪৮+

শ্রীনরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষিত হওয়ার পর যখন ২৭২+ মিশন ঘোষণা করেন ভারতের বেশির ভাগ মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এটা অসম্ভব বলে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন। অবশেষে ১৬ মে বিকালে সেই অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হলো। এর ফলে মানুষের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যদি বিজেপি ১৪৮+ মিশন স্থির করে যোজনা করে তাহলে পশ্চিমবাংলারও শাসনভার ভারতীয় জনতা পার্টির হাতেই আসবে।

—**জয়দেব সাহা,**
আলাল, মালদহ।

দুই বাংলা দুই বাঙালি

গত প্রায় এক বছর ধরে বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনের নামে যে ধ্বংসাত্মক ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে বিএনপি এবং জামাত, হেফাজত প্রভৃতি উগ্র ইসলামিক মৌলবাদী সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী, তার হাত থেকে রেহাই পায়নি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত হিন্দুরাও। বাংলাদেশে বিধর্মী সংখ্যালঘু অস্তিত্ব মুছে ফেলতে তারা চালাচ্ছে 'ক্লিনজিং অপারেশন'।

তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর চালানো অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় এপার বাংলার সেকুলারবাদী কংগ্রেস, তৃণমূল, বামরাজনীতির নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা পালন করছেন শ্মশানের নীরবতা। কেউ করেননি ওই নির্যাতনের নিন্দা বা প্রতিবাদ। মিছিল-মিটিং তো দূর-অস্ত্। প্রতিবাদের মোমবাতিও জ্বলেনি কারো হাতে। হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশও রয়েছে মুখে কুলুপ এঁটে। অথচ এদেরই দেখেছি, বিতর্কিত বাবরি ধাঁচা ধূলিসাৎ, গুজরাট দাঙ্গা, সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড বা প্যালেস্টাইনের উপর ইসরাইলি হামলার পর প্রতিবাদের মিটিং-মিছিল তীব্র নিন্দা উগরে দিতে, চোখের পানিতে বুক ভাসাতে। আবার এঁরাই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলে বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে করেছেন এরাজ্য ছাড়া। আর এসবই এঁরা করেছেন এরাজ্যের মুসলিম মৌলবাদীদের খুশি করতে, সেকুলার সাজতে। ভাবতে অবাক লাগে, ও বঙ্গের বাঙালি হিন্দু নির্যাতনের খবর শুনেও এ বঙ্গের সেকুলারবাদী বাঙালিরা যখন নীরব, তখন এ দেশেরই তামিলনাড়ুর সব শ্রেণীর তামিল শ্রীলঙ্কায় তামিল হত্যা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে হয়েছে সরব। তাই তামিলদের কাছ থেকে বাঙালিদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। বলতে দ্বিধা নেই, ভণ্ড সেকুলারবাদী বাঙালিরাই ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর বাঙালি হিন্দু সমাজ গঠনের পথে বড় অন্তরায়। সত্য, কি বিচিত্র এই সেকুলারবাদীরা!

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

মিথ্যা কথা

"গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পারি তৃণমূল কখনও রিগিং করে না"— মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাটি সংবাদপত্রে বের হয়েছে, তা না হলে এটা শুনলে 'ঘুরায় (ঘোড়ায়) হাসব', কোনো উন্মাদকে বললে সেই পাগল হেসে লুটোপুটি খাবে, আর কোনো জন্মবোবাকে দেখালে সে জীবনের প্রথম কথাটি বলে উঠবে—এই কথাটি মনে হয় গীনেস্ বুক অব নলেজে স্থান পাবেই। যাইহোক, দিদিমণি যদি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ওই কথাটি বলেন তাহলে অনেকে বলছে, গঙ্গানদী শুকিয়ে যাবে, আবার কোনো জহ্নুমুনির প্রয়োজন হবে তাঁর জানু থেকে গঙ্গাকে বের করার জন্য। ত্রিপিটক হাতে নিয়ে বললে বৌদ্ধরা 'বুদ্ধ' হয়ে যাবে। গ্রন্থসাহেব হাতে নিয়ে বললে পাঞ্জাবীদের ঝুঁটি খসে পড়বে, কোরান হাতে নিয়ে বললে যে কি হবে! অবশ্য তিনি তা করবেন না কারণ অত বড় মিথ্যা কথা কোরান হাতে বললে সকল সংখ্যালঘু তাঁর ওপর থেকে সমর্থন তুলে যে নেবেই একথা বলা বাহুল্য।

তবে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তাঁর মন্তব্যের যথার্থতা বিচার হবে। গত ৮ মে, ২০১৪-এ সংবাদপত্রে প্রকাশ— সোনামুখীর তৃণমূল বিধায়ক দীপালি সাহা বুথে ঢুকে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগে এফ আই আর দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন। এই খবর কি দিদির নজরে বা গোচরে আসেনি? ঘটনা নং দুই, পঞ্চাশ বছরের পর শেকড়ের টানে ঘরে ফিরেই লোকসভার যুদ্ধে নেমেছেন চন্দন মিত্র। একসময় স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডের ডক্টরেট আর ইংরাজি দৈনিক, 'দ্য পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক এবং সেইসঙ্গে রাজ্যসভার সদস্যও। এই প্রকার এক ব্যক্তি হুগলীর নির্বাচন যুদ্ধে নামতে দিদির দল বেগতিক বুঝে তার বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগ 'নোট বিলি' নামক দুর্নাম দিয়েছে।

প্রশ্ন, এমন একজন উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে হারাবার জন্য তৃণমূল যে এই প্রকার হীন পরিকল্পনা নিয়েছে দিদি কি এই ব্যাপারে অবগত আছেন? তিনি কি কুম্ভকর্ণের ভূমিকায় না ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ? দিদি কি নিজ দলের কুকর্মের ব্যক্তিগুলিকে দেখতে পান না? তাহলে আর তাঁর নামে তিনি সৎ তিনি সৎ করে এত চিৎকার করার কি আছে? তাহলে শুধু সারদার ব্যাপারে নিজে হাতে কোনো অর্থ না নিলেই সৎ, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সততার কোনো মূল্য নেই? দিদিঅন্ত প্রাণ যখন জনগণ তখন বুথ দখল, ছাপ্পা রিগিং-এর কি প্রয়োজন?

তাই বলি, পবিত্র গঙ্গাজল হাতে নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যা কথা বলে গঙ্গাজলকে অপবিত্র করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

—**দেবু সরকার,** মেমারী

থিম স্টাডি

অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত সরকার

আজকাল 'থিম স্টাডি' চালু করা হয়েছে। যখনই নতুন কিছু চালু করা হয় তখনই তার পিছনে কি উদ্দেশ্য তা না খুঁজে আমরা অনেকেই তা গ্রহণ করি, যেমন আমরা নতুন দাড়ির ফ্যাসন যা অনুকরণ করছি তার উৎপত্তি, উদ্দেশ্য না খুঁজেই করছি। 'থিম স্টাডি' দ্বারা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞতা জন্মায়। যে জাতি নিজের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যত বেশি অজ্ঞ তাদের শাসন করা, তাদের অধিকার হরণ করা, তাদের ধর্মান্তরিত ও জাতিসত্তা লোপ করা এবং শেষে তাদের বাসভূমি দখল করা ততই সহজে সম্ভব হয়। অতীতের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে এই বর্তমান এবং সেই প্রক্রিয়ারই দ্বারা ভবিষ্যৎ পরিণতি। যেমন, ধর্মান্তরকরণ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও তাকে বলবৎ হাজার বছর ধরে করে করে পৃথিবীর প্রাচীন জাতির জাতিসত্তা দেশে দেশে বিলোপ হয়েছে এবং সেখানে খৃস্টান ও ইসলাম সমাজ সৃষ্টি রয়েছে তারা সংখ্যাগুরু জনসংখ্যায় পরিণত হবার ফলে। ভারতের বাইরে এই প্রক্রিয়া দ্বারা ইউরোপের, আফ্রিকার, আমেরিকার, অস্ট্রেলিয়ার, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার মানুষের আজ আর তাদের প্রাচীন ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা নেই। নেই প্রাচীন ভারতের আফগানিস্তান, সিন্ধু, বালুচিস্তান প্রভৃতি স্থানেরও। বর্তমান ভারতের সংখ্যাগুরু মানুষের জাতিসত্তা যদি রক্ষা করতে হয় তবে ধর্মীয় জনসংখ্যার পুনর্বিন্যাসের ধারার দিকে তাকানো খুবই প্রয়োজন। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রশক্তি কাদের হাতে যাবে আর কে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করবে সেটাই এখন প্রধান কথা। ভারতবাসীর স্বার্থ হলো তাদের ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা রক্ষা করা আর ধমান্তরকারীদের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীর ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা বিলোপ করে তাদের বিশ্বাসে ভারতবাসীকে বিশ্বাসী করা। ভারতবাসীই একমাত্র জাতি যাদের জাতিসত্তা হাজার বছর ধরে শত চেষ্টা করেও ধ্বংস করা বাকি আছে। কিন্তু চেষ্টা চলছে।

১২০৪ সালে বক্তিয়ার খিলজীর বাংলা দখলের পূর্বে বাংলায় মুসলমান সমাজ সংগঠিত ছিলই না। তারপর রাষ্ট্রশক্তি হাতে থাকায় ১২০৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ধর্মান্তরকারী সম্প্রদায় যে যে জেলায় ধর্মান্তর করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো সেই জেলা নিয়ে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়ে গেল। ভারতবাসী জমির অধিকার হারালো, মুসলমানরা নতুন জমি লাভ করল আন্তর্জাতিক আইন বলে।

১৯৪০ মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি যখন অনেকেরই মাথাব্যথা সৃষ্টি করেছে তখন জাতিতত্ত্ব বিষয়ে গভীর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভারতরত্ন আম্বেদকর ঘোষণা করলেন— সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরস্থায়ীভাবে দূর করার একমাত্র পথ হলো ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের পাকিস্তান দিয়ে তারপর সংখ্যালঘু বিনিময় করতে ('That the transfer of minorities is the only lasting remedy for communal peace is beyond doubt'-- Pakistan or the Partition of India, p. 116)। এই একই মতালম্বী ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বল্লভভাই প্যাটেল। কংগ্রেস তাঁদের কথা শোনেনি। দেশভাগের পর ৬৭ বছরের মধ্যে প্রাক্ পাকিস্তান সৃষ্টির সেই একই লক্ষণ কি আবার দেখা যাচ্ছে না? সেইদিন পাকিস্তান হবার আগে সিডিউল্ড কাস্টের জন্য দরদ লিগের যেমন উথলে উঠেছিল আজও কি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য, দলিতদের জন্য নেতাদের উথলে উঠা দরদ দেখা যাচ্ছে না? সেদিন যেমন সিডিউল্ড কাস্ট ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা শুরু হয়েছিল আজও কি সেই চেষ্টা শুরু হয়নি? মুসলিম লিগদল এখন পশ্চিমবঙ্গে নেই, কিন্তু নতুন দল তৈরির কথা কি হাজি সাহেবের মুখে শোনা যাচ্ছে না? দিদি যতই নামাজ পড়ুন, মাটি কি থাকবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, জোড়াতালি দিয়ে চিরকালের প্রয়োজন মিটবে না।

অতীত, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের কথা না ভাবলে পূর্ববঙ্গের মতো এ জমিও হয়তো থাকবে না।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER
OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাসের আলোকে মথুরা-বৃন্দাবন

রবীন সেনগুপ্ত

ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির জগতে মথুরা-বৃন্দাবন একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম। শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকেন্দ্র হিসাবেই নয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরবর্তীকালেও মথুরা-বৃন্দাবনের অনেক ইতিহাস প্রভৃত অবদান রয়েছে।

বর্তমানে মথুরা একটি জেলা, যে জেলার প্রধান শহরের নামও মথুরা। তখন এই জেলায় চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমার দীর্ঘ এলাকা জুড়ে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত বৌদ্ধ মুসলমান ও খৃস্টানদের নানা মূল্যবান দলিল স্বরূপ স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। বৈষ্ণব ইউনিভার্সিটি, শ্রীচৈতন্য ইন্টার কলেজ-এর মতো উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মথুরা তৈলশোধনাগার, মথুরা মিউজিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রয়েছে বঙ্কুবিহারীর মন্দির, দ্বাদশ বন, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি, রাধামায়ের স্মৃতি বিজড়িত রাভেল ও বর্ষানা গ্রাম। রয়েছে বিশাল গোকুল মঠ, শ্রীচৈতন্য স্মৃতি বিজড়িত স্থান, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের মতো অজস্র কুণ্ড, বহুসংখ্যক ঘাট, নানা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

মথুরা এলাকাটি শূরসেন রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস মেথোরাকে শূরসেনা রাজ্যের প্রধান নগরী বলে উল্লেখ করে গেছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় মথুরা পাটলিপুত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ঊনবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ মথুরায় জন্মগ্রহণ ও মোক্ষলাভ করেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম হয়ে আছেন। সম্রাট অশোক মথুরায় একাধিক স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক মথুরাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ফা হিয়েন (৩৯৯-৪১৫ খৃঃ) ও য়ুয়ান চোঙ (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) এর বর্ণনাতেও মথুরার কথা জানা যায়।

দিনের পর যেমন রাত্রি আসে তেমনি দেবতাদের মুখ্য ক্রিয়াস্থল হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুযায়ী দেবতাদের শাসনের মাঝে মাঝেও অসুরদের শাসন বলবৎ হয়। আসুরিক শাসনগুলিও অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মথুরাও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু শ্রীকৃষ্ণর জন্মের সময়েই নয়, শ্রীরামচন্দ্রের আমলেও মধুদৈত্য নামে একজন শাসন করত মথুরা এলাকাটি। মধুদৈত্যের নাম থেকেই মথুরা নামটি এসেছে। মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন কৌশলে হত্যা করে নতুন নগর নির্মাণ করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গার পর পবিত্র নদী হিসাবে যমুনাকে গণ্য করা হয়। এই যমুনা, মথুরা এলাকায় গঙ্গার চেয়েও পুণ্যদায়িনী হিসাবে গণ্য হয়। রাধাকৃষ্ণের পবিত্র লীলার পর মথুরা একটি মহাপুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তার পূর্বে কাশী অযোধ্যা এবং পুষ্করই ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে প্রিয় তীর্থস্থান। শ্রীকৃষ্ণের লীলার পর মথুরা-বৃন্দাবন এবং দ্বারকাও প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। আধ্যাত্মিক আগ্রহীদের কাছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মথুরা-বৃন্দাবন কাশী অযোধ্যাকেও অতিক্রম করে যেতে থাকে জনপ্রিয়তার নিরিখে, আজও সেই জনপ্রিয়তা অটুট রয়েছে।

গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৮-তে মথুরা মণ্ডল আক্রমণ করেছিলেন। মহাবনের রাজা কুলচন্দ্র ও তাঁর ষাট হাজার বৈষ্ণব সেনা মামুদের লক্ষাধিক অসুর সেনার সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে সংখ্যালঘু হওয়ার দরুন পরাস্ত হয়। রাজা পরাজিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করেন। শতাধিক হস্তীর পিঠে চড়িয়ে মামুদ মথুরা লুণ্ঠনের ধন নিজ দেশে নিয়ে যান। মামুদের এক সহচর মথুরার প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন — যদি মথুরার তুল্য সুরম্য প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করতে চাও তবে সহস্র সহস্র সুবর্ণ দিবহ্যাম ব্যয় করতে হবে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুনিপুণ স্থপতি দিনাকে দুশ বছর অবিশ্রান্ত খাটালেও এইরকম সৌধাবলী নির্মাণ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

সেই সময় অন্তত গোটা পাঁচেক মন্দিরের প্রতিমাগুলি ছিল দশ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট এবং সোনার পাতে মোড়া। কয়েকটি মূর্তির চোখ ছিল মূল্যবান হীরা অথবা নীলকান্তমণি দ্বারা তৈরি।

এরপর শতশত বৎসর ধরে হিন্দুরা তিলে তিলে আবার গড়ে তুলতে থাকে ব্রজধামকে। তবুও বহু স্থান শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করত শত

শত বৎসর ধরে। সেকেন্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৭ খৃস্টাব্দ) এরপর আক্রমণ করে ব্রজধাম। তার সেনারা যেটুকু বাকি ছিল সেইটুকুও ভেঙ্গে খানখান করে দেয়।

কিন্তু অপরাজেয় হিন্দু সন্তানরা আবার উদ্যম নিয়ে দখল করতে থাকে মথুরা মণ্ডলের নানা এলাকা। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মুঘল সম্রাট আকবর ক্ষমতায় এলে মথুরা পুনরুদ্ধারের কাজে সুবিধা পাওয়া যেতে থাকে। এই সময়েই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরা-বৃন্দাবনের বহু স্থান নিজে উদ্ধার করে তার শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামীর হাতে সারাজীবন ব্যাপী এই ব্রজমণ্ডল সংস্কারের দায়িত্ব প্রদান করে যান। রূপ-সনাতনের মিলিত প্রচেষ্টায় আবার আস্তে আস্তে জেগে উঠে সমৃদ্ধ হতে থাকে মথুরা-বৃন্দাবন ধাম।

বারাণসীতে যেমন প্রায় শ' খানেক ঘাট আছে মথুরা মণ্ডলেও অনুরূপ ভাবে শ'খানেক ঘাট আছে। তার মধ্যে যে ঘাটগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হলো— বাঙালিঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, সোমতীর্থ ঘাট, ব্রহ্মলোকঘাট, চিন্তাহরণ ঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থ ঘাট, অসিকুণ্ডঘাট, বিশ্রামঘাট, গণেশঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট, কনখলঘাট, সূর্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, বুদ্ধঘাট, শান্তঘাট, স্বামীঘাট, রাধেশ্যাম ঘাট ইত্যাদি।

কাশীতে যেমন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা রয়েছে, ব্রজমণ্ডলে রয়েছে চৌরাশি ক্রোশপরিক্রমা। এই পরিক্রমা ব্রজবাসীরা পরিচালনা করেন নন্দোৎসবের পর দিবস থেকে। যাঁরা ভক্তি মার্গের নরনারী তাঁরা প্রতিদিন প্রায় দশ কিলোমিটার পদব্রজে হেঁটে আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদন গ্রহণ করেন। হিন্দু কৃষ্টি সংস্কৃতি ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্রের নানান জানা অজানা দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শ্রী নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ৩৩৪টি তীর্থের উল্লেখ করেছেন ব্রজমণ্ডল। তার মধ্যে রয়েছে ১২টি বন, ১২টি উপবন, ১২টি প্রতিবন, ১২টি আদিবন, ১২টি তপোবন, ১২টি মোক্ষবন, ১২টি কামবন, ১২টি অর্থবন, ১২টি ধর্মবন এবং ১২টি সিদ্ধবন। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো দ্বাদশ বন, এগুলির নাম হলো বৃন্দাবন, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, ভদ্রবন, খাদিবরণ, মহাবন, লৌহবন, বিল্ববন ও ভাণ্ডীরবন।

সমস্ত ব্রজমণ্ডলে প্রায় হাজার চারেক মন্দির রয়েছে। একটা নির্দিষ্ট বর্গকিলোমিটারের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক মন্দির বিশ্বের কোথায় রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই ব্রজমণ্ডলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

ব্রজধামে যে মন্দিরগুলিকে বৈষ্ণবরা অবশ্য দর্শনীয় বলে মনে করেন তার মধ্যে রয়েছে বঙ্কুবিহারী মন্দির, শ্রীগোপাল মন্দির, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, রাধা দামোদর মন্দির, ইস্কনের মন্দির, মীরাবাঈ তড়াশ, চৌষট্টি মাহান্ত মন্দির, অষ্টসখী মন্দির, ষড় গোস্বামী মন্দির ইত্যাদি।

বাংলার বিখ্যাত সাধক অবতার প্রভুজগৎবন্ধুর আশ্রম রয়েছে মথুরামণ্ডলে, রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম, বিড়লাদের মন্দির। ইস্কনের দৌলতে ব্রজভূমিতে বিদেশী ভক্তদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

১৭৫২ সালে আফগান সম্রাট আহমদশাহ আবদালী ভারত আক্রমণের সময় পুনরায় মথুরা আক্রমণ করেন। চলল লুঠপাট ধর্ষণ হত্যা। ১৭৫৭ সালের ১৫ মার্চ আবদালীর সেনারা গোকুল মঠের বিপুল ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের জন্য তাঁবু খাটাল পার্শ্ববর্তী এলাকায়। কিন্তু মাত্র হাজার খানেক নাগা সন্ন্যাসী ভোরবেলা স্নান ও পূজা ধর্মরক্ষার জন্য গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে আবদালীর সেনাদের তাঁবুতে ঢুকে ত্রিশূলের আঘাতে হত্যা করতে লাগল ঘুমন্ত মুসলমানদের। অতর্কিত গেরিলা আক্রমণে দিশাহারা আবাদালী ও তার বাকি সৈন্যরা বেগতিক দেখে পলায়ন করল দ্রুত গতিতে।

শিবরাত্রির দিন রমনরেতিতে যে মেলা বসে তাতে চারদিন ব্যাপী গোপাল জয়ন্তী পালন করা হয়। এই সময় বড় ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। দেশ বিদেশের বহু মানুষ এটিতে অংশ নেয়। এই রমনরেতিতেই একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে অনাথদের বিনা বেতনে পড়ানো হয়।

ঔরঙ্গজেব মথুরা বৃন্দাবন ও মহাবনের কিছু অংশ ধ্বংস করেন। পরে হিন্দুরা সেটিকে মন্দিরে পরিণত করে নাম দেয় নন্দভবন। অর্থাৎ শুধু বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য আরো অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুরা তাদের কলঙ্ক চিহ্নগুলি নিপতিত করে পুনরায় দেবমূর্তি স্থাপিত করতে সক্ষম হয়।

মথুরা মণ্ডলে কাটবার মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল ১১৫০ খৃস্টাব্দে। সেকেন্দার লোদী এটিকে ধ্বংস করেন। পরে হিন্দুরা আবার এটিকে পুনঃনির্মাণ করেন। ঔরঙ্গজেব পুনরায় এটিকে ধ্বংস করেন। ভারতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে এই রকম দুর্দশা দেখে যুগল কিশোর বিড়লাকে এটি সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় করার অনুরোধ করেন। ১৯৪৪ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি বিড়লা কাটরা কেশবদেব মন্দির ক্রয় করে ১৯৫১ সালে মালব্যজীর অনুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবাসঙ্ঘ নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করে মন্দিরটিকে ট্রাস্টের হাতে তুলে দেন।

মথুরা জেলাটি বর্তমানে প্রায় ১৪৫৫ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট। এতে চারটি তহশিল রয়েছে। যথা ছাতা-মথুরা, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট, মাট ও সাদাবাদ। জেলায় শহর মোট ৬টি। যথা মথুরা, কোশি, কালান, গোবর্ধন, সাদাবাদ ও বৃন্দাবন। ছোট শহর আরো গোটা সাতেক। যথা ছাতা শাহ পার্ত, মহাবন, রায়া বলদেও মোনথ ফারা, গোকুল, রাধাকুণ্ড ইত্যাদি। জেলায় গ্রামের সংখ্যা ১০১৪টি। জেলায় হিন্দুর সংখ্যা ৯২ শতাংশ, মুসলমান ৭ শতাংশ, হিন্দিভাষী ৯৬ শতাংশ, উর্দুভাষী ৩ শতাংশ, বাংলাভাষী ১৯ শতাংশ প্রায়। বৃন্দাবনে সবচেয়ে বেশি বাঙালি রয়েছে।

রমনরেতি নামের স্থানটিতে সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে বৃন্দাবন রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এতে জেলাটি সম্পর্কে আরো অনেক নতুন কিছু জানা যাচ্ছে। এতে হিন্দুধর্মের ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক খুঁটিনাটি দিক জানবার সুযোগ বেড়ে যায়। তবে মশার উপদ্রব থাকায় সঙ্গে অনেকেই মশারি নিয়ে যান। অ্যালুমিনিয়ামের থালা ও গেলাস নিয়ে মন্দিরে বাস বাঞ্ছনীয়। ফ্যান্সি ডিস তাঁরা পছন্দ করেন না।

আশ্রমগুলিতে পোলাওকে বলা হয় পুষ্পান্ন, খিচুড়িকে বলে মিশ্রান্ন, পায়েসকে বলে পরমান্ন, ঝোলকে বলে রসা। আর ভাতকে তারা যে অন্ন বলেন সেকথা অনেকেই জানেন। লুঙ্গি পরে আশ্রম বাস করলে

বৈষ্ণবরা বিরক্ত হন, ভাবেনও কোনো যবন (মুসলমান) কালচারের লোক এল রে বাবা। কাজেই সঙ্গে ধুতি রাখা আবশ্যক।

কেবারি বনের কাছে বৈষ্ণবদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু রামদাস কাঠিয়া বাবার একটি আশ্রম রয়েছে। রামদাসবাবা পাঞ্জাবের মানুষ ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে পেশায় হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন। এই আশ্রমের কাছে বৈষ্ণব পারমার্থিক ইউনিভার্সিটিটি অবস্থিত। শ্রীমদ ভক্তিহৃদয় স্বামী এই ইউনিভার্সিটিটির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমন্ত্রণে ইউরোপ গমন করেন। হিটলারও তাঁর মত গুণী পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই আশ্রমটির পরেই বিহারবন। এরই এক অংশের নাম রমনরেতি। এখানেই ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে গড়ে উঠেছে ইস্কনের বৃন্দাবন মঠ।

১৮৭৪ সালে স্থাপিত হয় মথুরা মিউজিয়াম। এটি বহু মূল্যবান দর্শনযোগ্য ও গবেষণাযোগ্য বস্তু রয়েছে। আগ্রা থেকে মথুরার দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। আর দিল্লী থেকে মথুরার দূরত্ব ১৪০ কিলোমিটারের কিছু অধিক। দিল্লী যাওয়ার বহু ট্রেনই মথুরা হয়ে যায়। মথুরা থেকে দিল্লী ট্রেনে ঘণ্টা তিনেকের পথ। মথুরায় চারটি রেল স্টেশন রয়েছে যথা— মথুরা জংশন, মথুরা ক্যান্টনমেন্ট, ভূতেশ্বর ও মসানি।

ব্রজমণ্ডলের রঙ্গনাথজীর মন্দিরটি উত্তর ভারতের অন্যতম বৃহৎ মন্দির। এলাকার বিখ্যাত ধনী লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের দুই জন শেঠ গোবিন্দ দাস ও শেঠ রাধাকৃষ্ণ ১৮৫১ খৃস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। এই দুই শেঠ ভ্রাতার গুরু ছিলেন রঙ্গাচার্যজী। রঙ্গাচার্যজীই ৭৭৯ ফুট বাই ৪৪০ ফুটের বিশাল এই মন্দিরটির নকশা তৈরি করেন। টানা ছয় বছর লেগেছিল মন্দিরটি নির্মাণ করতে।

এই বৃহৎ মন্দিরটির কাছেই ১৬০ ফুটের অপর একটি মন্দির রয়েছে। এটির নাম লালাবাবু বা কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গনাথজী বলে ডাকার প্রবণতা রয়েছে সর্বাধিক। বৈষ্ণবদের চারটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন লক্ষ্মীদেবী। শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে ধনসম্পদ নিয়েই রাধাকৃষ্ণের আরাধনার ব্যাপক চল রয়েছে। নিম্বার্ক বৈষ্ণব মধ্বাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়ার যে চল রয়েছে তা শ্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই বললেই চলে।

বৃন্দাবনে সবচেয়ে বেশি ভীড় হয় বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণবরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এবং ভীড় জমান ষড় গোস্বামীর মন্দিরে। অনেক বাঙালি বৈষ্ণব মনে করেন যে বৃন্দাবনে এসে ষড়গোস্বামীর মন্দির দর্শন করলে আর কোনো কিছু দর্শন না করলেও চলে।

সাধক রয়েছেন যাদের নাম হরিদাস। বৃন্দাবনে যে বিখ্যাত বাঁকাবিহারী বা বঙ্কুবিহারীর মন্দিরটি রয়েছে সেটির নির্মাতা হরিদাস স্বামী নামে অপর এক বিখ্যাত নাদব্রহ্মযোগী অবাঙালি বৈষ্ণবের শিষ্যরা। এই হরিদাস স্বামীর পিতার নাম আশাধীর, আদি নিবাস কোলগ্রামের কাছে হরিদাসপুরে। অন্য মতে তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা ছিলেন। হরিদাসের সম্ভাব্য জন্মস্থান ১৪৬৯ খৃস্টাব্দ।

আকবরের সভার বিখ্যাত গায়ক মিঞা তানসেন হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। বৈজু, গোপালজী, সোমনাথ, দিবাকরদের মতো

বৃন্দাবনের এক মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি।

তৎকালীন সঙ্গীতজ্ঞরাও হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। মুঘল সম্রাট শ্রদ্ধাবশত হরিদাসকে যে জমি দান করেছিলেন সেই জমির উপরেই এই বঙ্কু বিহারী মন্দিরটি স্থাপিত হয়। সারা পৃথিবীতে জাগ্রত বিষ্ণু মন্দিরের মধ্যে চারটি নামকে সমপর্যায়ে রাখা হয়। তার মধ্যে একটি হলো তিরপতি মন্দির, অপরগুলি হলো পুরীর জগন্নাথ মন্দির, গুজরাটের দ্বারকাধীশ মন্দির ও ব্রজমণ্ডলের এই বঙ্কুবিহারী মন্দির।

জগদীশ্বরী রাধিকা দেবী বৃষভানু নামে এক নামজাদা ধনী গোপের গৃহে রাভেল নামে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাভেল গ্রামটি কংসের অনুচরদের আওতার মধ্যে থাকায় সেখানে তারা প্রায়শই আসুরিক আচরণ করত। যার জন্য বৃষভানুজী পরে সেখান থেকে অনেক দূরে বর্ষানা এলাকায় উঠে যান। বর্ষানায় রাধিকাদেবীর স্মরণে সুন্দর মন্দির রয়েছে। তার ভিতর ধনসম্পত্তি লুকানো আছে এই সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা সেটিকে আক্রমণ করে ভাঙচুর ও খোঁড়াখুড়ি করে। ওই এলাকায় রাধা মাকে লাডলি নামে ডাকা হোত। আর শ্রীকৃষ্ণকে বলা হোত লাডলি মোহন।

বাঙালি বৈষ্ণব সাধক যবন হরিদাস ছাড়াও বৈষ্ণবদের মধ্যে একাধিক নামজাদা

মথুরা হলো হিন্দুদের বৃহত্তম সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের রাজধানী। বর্তমানে হিন্দুদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হলো বৈষ্ণব। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের এবং অবৈষ্ণবদেরও অতি দর্শনযোগ্য স্থান। ব্রজমণ্ডলকে সরকার আরো ভালো ভাবে সংরক্ষণ করুক এটাই আমাদের প্রার্থনা।

নবাঙ্কুর

গড়ে তোলার কাজ

পরিবেশ দিবসে সপ্তর্ষিরা

কৌশিক গুহ

এবারের গরমে সকলেই খুব কষ্ট পেয়েছে। রোদের তাপ খুব বেশি। সপ্তর্ষির মনে হোত সূর্য বোধহয় খুব কাছে চলে এসেছে। দুপুরে কোথাও যাওয়া, খেলা বারণ। স্কুল ছুটি। ওদের পাড়ার সুমিতকাকু বলল, ‘বর্ষা আসার কথা নিয়ম মেনে জুন মাসের আট তারিখ নাগাদ। এবারে গ্রীষ্মের যা দাপট তাতে মনে হয় বর্ষা আসতে দেরি হবে। বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে হবে। জুনের পাঁচ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমাদের চারপাশের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে আমরাই দায়ী। আবার আমরা সতর্ক হলে পরিবেশ অন্যরকম হতে পারে। সকলে মিলে কিছু ভাবা যায়, করা যায়।’

কয়েকজন শুনল কথাগুলো। কি করা যায় আলোচনা হলো কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক করা হলো চারটে কাজ হবে। সকালে পরিবেশ সচেতনতা জাগাবার জন্যে পদযাত্রা হবে, গাছ লাগানো হবে নানা জায়গায়, পরিবেশ নিয়ে প্রদর্শনী হবে। আর পরিবেশ নিয়ে অনুষ্ঠান। যে কোনো কাজ করতে গেলে খরচ আছে। কিভাবে কাজ হবে, কারা কোন ভূমিকা নেবে সব ঠিক করে নিতে হয়। নয়তো সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়, যেতে বাধ্য। সুদর্শন রায়কে কয়েকটা দায়িত্ব দিলো সুমিতকাকু। একটু বাদে জিগগেস করল, ‘তোর উপর কোন কোন কাজের দায়িত্ব?’ সুদর্শন ঠিকমতো বলতে পারল না। সুমিতবাবু বলল, ‘লিখে নে।’ সুমিতকাকুর স্মৃতিশক্তি বেশ জোরালো। তবে শুধু স্মৃতির উপর ভরসা করে কোনো কাজ করে না। কাগজে লিখে ফেলে কি কি কাজ কে কে কোন দায়িত্ব নেবে। বার বার তাগাদা দেবে না, রোজ সন্ধ্যেবেলা জানাতে হবে কাজ কতদূর।

পাড়ার বড়োরাও যোগ দিয়েছে। টাকা পয়সার ব্যবস্থা হয়েছে। সুমিতকাকু বিশ্বাস করে একটা কথা, ভালো কাজ পয়সার জন্যে আটকায় না। সপ্তর্ষির বাবা মা পিসি তিনজনেই টাকা দিয়েছে পরিবেশ দিবসের কাজে। শুধু তাই নয়, থাকবে বলেছে। ফোটোগ্রাফার পিন্টু চৌধুরী প্রতিবারের মতো এবারেও তৈরি। কত ছবি তোলে, একটাও পয়সা নেয় না। পৃথ্বীশ শিকদার ছোটোদের দিয়ে ছবি আঁকিয়েছেন কয়েকদিন ধরে। সেইসব ছবির প্রদর্শনী হবে। সপ্তর্ষিও এঁকেছে। গাছের চারা এনেছে ছোটো বড়ো নানারকম টবে। গাছ লাগাবার পর বেড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা থাকছে। সন্ধেবেলা পরিবেশ নিয়ে গান নাটক বক্তৃতা আলোচনা। চারপাশে যেন উৎসবের মেজাজ। গত কয়েকবছরে লাগানো গাছগুলোর সব কটা বেঁচে নেই ঠিকই, তবেই অনেকগুলো চমৎকারভাবে বেড়ে উঠেছে। সপ্তর্ষি দেখেছে ওদের এলাকায় গাছের প্রতি ভালোবাসা সকলের আছে।

‘পরিবেশ তো শুধু গাছ নয় অনেক কিছু তার সঙ্গে জড়ানো। আমাদের চারপাশকে সুন্দর করতে হবে। লোকদেখানো উপর চকচকে নয়। সত্যিকারের সৌন্দর্য অন্যরকম। সেটাই চাই। প্রতিটি বাড়ি প্রত্যেক রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। ছোটো বড়ো সকলেরই থাকবে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। আর পরিবেশ দিবস বছরে একদিন পালন করেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। এ কাজ প্রতিদিনের। প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ভূমিকা আছে।’ একথা বললেন স্থানীয় শিক্ষক সনৎ মুখোপাধ্যায়।

রাত ন’টায় অনুষ্ঠান শেষ হলো। সুমিতকাকু খুব ব্যস্ত, অথচ সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছে। সপ্তর্ষিকে দেখে বললেন, ‘তোর আঁকা ছবি দেখেছি।’ সপ্তর্ষি চমকে দিল সুমিতকে। সে একটা কার্ড তৈরি করে এনেছিল সুমিতের জন্যে। দিতে খুব খুশি। গরমের হলকা একটু কম। কয়েকবছর আগে লাগানো গাছগুলো হাওয়ায় মাথা নাড়াচ্ছিল। আজ তাদেরও খুশির দিন। বৃষ্টি এলে তারা স্বস্তি পাবে। স্বস্তি পাবে পশুপাখি, মানুষ। সপ্তর্ষি বাড়ি ফেরার আগে তার বাবাকে বলল, ‘পিন্টুকাকুর কাছ থেকে একটা ছবি নেবে?’ পিন্টু সপ্তর্ষির আঁকা ছবির সামনে দুটো ছেলের ছবি তুলেছিল। সেটা দিয়ে দিল। পিছনে লেখা— ‘পরিবেশ দিবসে সপ্তর্ষিকে শুভেচ্ছা।’

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

ঠাকুমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে যায় শরণ্যা

'ছাপা বই আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চিরদিনের জন্যে। চারপাশে যতই পরিবর্তন হোক না কেন বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে যাবে। বইকে আঁকড়ে ধরেই এগোতে হবে আমাদের।' কথাগুলো স্বরূপকাকুর ঘরে লেখা। লেখাটা বারবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে শরণ্যার। ভাইঝিকে নানারকম বই পড়তে উৎসাহ দেয় স্বরূপ। যথেষ্ট স্বাধীনতা তার। আগে মা একটু বকাবকি করত। পরে বুঝেছে মেয়ে বইয়ের মধ্যে অন্য জগৎ খুঁজে পেয়েছে। শরণ্যার বাবারও পড়ার অভ্যেস আছে। তবে স্বরূপকাকুর মতো নয়। কাকু বলেছে, যে কোনো বই দেখো, পড়ো। তবে মনে রাখবে যেখানকার বই সেখানে রেখে দিতে হবে যত্ন করে। বই তোমার বন্ধু হবে। সে আর কিছু চায় না, শুধু চায় যত্ন। সে তোমাকে অনেক দেবে। সবসময় তার সঙ্গ পাবে।' শরণ্যার মনে বইয়ের জন্যে আলাদা জায়গা তৈরি হয়েছে। তার নিজের বইও কম নয়।

শরণ্যাদের বাড়ির কাছে বড়ো লাইব্রেরি আছে। বিরাট বাড়ি। অনেক বই। সেই বাড়ির একটা অংশে রয়েছে ছোটোদের লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরিতে প্রায়ই যায়। বাড়ির কেউ পৌঁছে দেয়। আবার নিয়ে আসে। ঠাকুমার সঙ্গে এলে বাড়ি থেকে কারও আসার অপেক্ষায় থাকতে হয় না। ঠাকুমা লাইব্রেরিতেই থাকেন। শরণ্যা চলে যায় ছোটোদের বিভাগে। আর ঠাকুমা ঢোকেন বড়দের পড়ার জায়গায়। কোনো-না-কোনো বই নিয়ে বসে পড়েন পড়তে। বেশ কয়েক পাতা পড়া হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন এ বই সে বই দেখেন। একসঙ্গে অনেক বই দেখার সুযোগকে কাজে লাগাতে চান। কত বইয়ের সঙ্গে পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। লাইব্রেরিতে সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। যখন যে বই দেখতে চান তা দেখানোর চেষ্টা করে কর্মীরা। কোনও কর্মীকে ডেকে বলেন, 'আমার নাতনি শরণ্যা ছোটোদের বিভাগে আছে ওকে টিফিন আর জল দিয়ে আসবে ভাই?' সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মী ছুটে যান। বাড়ি ফেরার সময় শরণ্যা বলে মন দিয়ে পড়া বইটার কথা। ঠাকুমা শোনেন নাতনির সব কথা।

শরণ্যা লক্ষ্য করেছে ছোটো থেকে রোজই কিছু-না-কিছু পড়ে ঠাকুমা। কত গল্প শুনেছে ঠাকুমার কোল ঘেঁষে বসে। সেই গল্প শোনার মজাই আলাদা। শরণ্যার অনেক সময় মনে হয়, যাদের ঠাকুমা নেই তাদের খুব কষ্ট। তারা জানতেই পারে না অনেক কিছু। স্কুলে ওদের ক্লাসে যারা পড়ে তাদের মধ্যে প্রায় সকলের ঠাকুমা রয়েছে। তবে শুধু শরণ্যার ঠাকুমাই বইকে ভালোবাসেন। রোজ পড়ে। দুজনের ঠাকুমা বৃদ্ধা আশ্রমে থাকেন। ঠাকুমাকে দেখতে না পাওয়ার জন্যে খুব কষ্ট পায় তারা। তাদের বাবা-মা দুজনেই খুব রাগী। ঠাকুমার কথা বলতে চায় না। দেখতেও যায় না। মাঝে মধ্যে শুধু টাকা পাঠিয়ে দেয়। ঠাকুমার যে মন আছে সেটা বুঝতে চায় না। শরণ্যা সব শুনে কষ্ট পায়। তার বাবা-মা ওইরকম ব্যবহার করেনি ঠাকুমার সঙ্গে। বাবা তো অফিস থেকে ফিরে ঠাকুমার কাছে বসে গল্প করে। শরণ্যাকে বলে বাবা, 'আমার মা তোকে ভালোবাসে বেশি, না আমাকে?' শরণ্যা বলে, 'ঠাকুমাকেই জিগগেস করো।'

বইমিত্র

গাছ চাই, আরও গাছ

মডেলিং : এক মন্দ পেশা

স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল অসংখ্য পেশা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সমাজে। কিন্তু কোনো পেশাকেই আমরা কখনো ভালো বা মন্দের দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখি না। এ রকমই এক 'দামি' কিন্তু মন্দ পেশা হলো মডেলিং। আজকাল ছেলেমেয়েদের সামনে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড-এর আকর্ষণ সব থেকে বেশি। দু' তিন বছর বয়সেই মডেলিং-এ নেমে পড়ছে শিশুরা। বরং বলা ভাল, শিশুদের এই জগতে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসছে তাদের বাবা-মায়েরা। এই বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের ছোট থেকেই 'আইটেম' বানানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন। ১৩-১৪ বছর বয়স থেকেই অনেক মেয়ের মধ্যেই অদ্ভুত একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে— তা হলো 'মডেল' হওয়ার বাসনা। এরা এই বয়স থেকেই গ্ল্যামার জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মডেলিং-এর মতো জঘন্য পেশায় নাম লেখায়।

মডেলিং এমন একটি পেশা যেখানে মেয়েদের যতটা সম্ভব বে-আব্রু করে দেখানো হয়। এই পেশার বেসিক ক্রাইটেরিয়া বা মূল বিচার্য, প্রতিপাদ্য এটাই। মডেলিং-এর নামে মেয়েদের যতটা সম্ভব আব্রুহীন করে মুনাফাখোর কোম্পানি। একজন মডেলের শরীর যতটা অনাবৃত থাকবে ততটাই মডেল হিসেবে তার সুখ্যাতি ছড়াবে, ততই আর্থিক জগতে সে সাফল্য পাবে ও তথাকথিত সমাজে সাহসিকতার পরিচয় বহন করতে পারবে। ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমী দেশগুলোতে এই পেশার রমরমা চললেও ভারতে এই পেশাটি তখনো পর্যন্ত প্রবেশ করেনি বা ছাড়পত্র পায়নি। ছাড়পত্র পেল যখন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় মেয়েদের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র দিলেন এবং মেডিক্যাল ছাত্রী রীতা ফেরিয়া-কে ভারতের তরফ থেকে মনোনীত করে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় পাঠালেন। রীতা এই প্রতিযোগিতা জিতে এসেছিলেন, শ্রীমতি গান্ধী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এটিকে মহিলা ক্ষমতায়নের একটি দিক বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্যাস, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতে এই নোংরা পেশাটির জয়যাত্রা।

অঙ্গনা

ইদানীং পাড়ায় পাড়ায় মডেলিং শেখানোর নামে মডেলিং ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। এগুলো আর কিছুই নয়, শরীর দেখানোর রেজিস্টার্ড কেন্দ্র। এইসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিষিদ্ধপল্লীর দালালদেরও যোগাযোগ থাকে। এইসব দালালরা অনেক সময়ই মডেলিং-এর নাম করে অনেক সরল-সোজা মেয়েকেও দেহ ব্যবসায় নামিয়ে দেয়। মডেলিং জগতে যারা আসে তাদেরকে পরিবার, সংসার এবং সুস্থ ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে খুব কৌশলে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেয়েরা আধুনিকতার নামে, ক্ষমতায়নের নামে এবং গ্ল্যামারের জন্য তাদের সব লাজলজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে, সম্পর্কের টান অস্বীকার করে মডেলিং দুনিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। অনেকেই আবার অন্ধকার জগতের অতল তলে হারিয়ে যায়। যারা এই জগতে টিকে যায় বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাদের জীবনটা অনেকটা প্রদীপের আলোর মতন। পেশার গ্ল্যামার-এর দিকটা উজ্জ্বল থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনটা তাদের প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতন।

মডেলিং-এর সঙ্গে বেশ কিছু সমান্তরাল পেশা গড়ে উঠেছে, অনেকটা শিল্প ও অ্যানসিলরি শিল্পের মতো, যাদের এসকর্ট সার্ভিস বা কলগার্ল সার্ভিস বলা হয়। এগুলোকে সুকৌশলে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ দেহ ব্যবসাকে কৌশলে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সত্যি কি হতভাগ্য আমাদের দেশের ওই মেয়েরা!

এই নোংরা পেশার উপস্থাপনা এতটাই সুন্দর যে আজকালকার যুবতীরা সামান্য অর্থ ও গ্ল্যামারের লোভে নিজেদের সবকিছু বিকিয়ে দিচ্ছে এই অন্ধকার দুনিয়ায়। মা, বোন, স্ত্রী, সহযোগিনী, বন্ধু হিসেবে নারীর বিভিন্ন রূপ আজ বিকৃত। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় নারীর মতো 'ভোগ্যপণ্য' আজ সব ভোগ্য বস্তুকে টেক্কা দিয়েছে। এর ফলে সমাজে নারীঘটিত অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''আমাদের দেশের মেয়েরা খুব বিদুষী হোক, কিন্তু কখনোই আত্মমর্যাদা, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে নয়।'' আজ কোথায় লজ্জা, কোথায় আত্মমর্যাদা!

রাণী দুর্গাবতী, জীজাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ, মাদাম কামা, শান্তি-সুনীতি- প্রীতিলতা, মা সারদা, ভগিনী নিবেদিতা, রাণী রাসমণি-র দেশের মেয়েরা আজ আত্মবিক্রীত। নোংরা পথকেই বেছে নিয়ে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে মা, বোন, স্ত্রী-র মতো পবিত্র সম্পর্কগুলি। আজ সময় এসেছে আবার নতুন করে এই মহীয়সী নারীদের চরিত্র আধুনিক মেয়েদের সামনে তুলে ধরার, যাতে তারা বিপথে চালিত না হতে পারে। মেয়েদের সঠিক ইতিহাস এবং মহীয়সী নারীদের জীবনী চর্চায় উৎসাহ দিতে হবে এবং তার সঙ্গে অনুশাসন, দেশপ্রেম ও শরীর চর্চারও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই শরীর চর্চার অর্থ আক্ষরিক ভাবেই শরীরচর্চা। শরীরচর্চার জন্য ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসীতে একটি মহিলা শরীরচর্চা কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। রূপচর্চা বাদ দিয়েও যে শরীর চর্চা হয়, সেই দিকটি মেয়েদের কাছে তুলে ধরতে হবে।

মডেলিং-এর নামে বর্তমান ভারতে নারী-শরীর কেনাবেচার বৃহৎ বাজার চলছে। সেই বাজার ততক্ষণই চলবে যতক্ষণ এই পেশাগুলি ভারতে টিকে থাকবে। এই পেশা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার, তা না হলে অধিকতর মেয়ে এদিকে ঝুঁকতে থাকবেই এবং তাদের বিপথে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। এর আর একটি দিক হল, এই পেশার মাধ্যমে যে বাজার চলে তার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক আমেরিকা। এই পেশা বন্ধ হলে শুধু মেয়েরাই উপকৃত হবে না, আমেরিকাকেও উপযুক্ত চ্যালেঞ্জ দেওয়া যাবে, যা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। নারী শক্তিরূপিণী; তাকে জেগে উঠতে হবে, কিন্তু পণ্য রূপে নয়।

মোদীর জয়ের নেপথ্যে

অতিথি কলম

তভলীন সিং

এবারের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কোনোরকম রফা ছাড়াই বিজেপি-র এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, ১৬ মে সকালবেলা পর্যন্তও দিল্লীর টিভি স্টুডিওতে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ করতে জড়ো হওয়া অধিকাংশ সাংবাদিক ভাবতেই পারেননি। সাংবাদিকতা হলো ইতিহাসের প্রারম্ভিক নিবন্ধীকরণ, কিন্তু যখনই একাজের বাস্তব দায়িত্ব ভার সাংবাদিকরা গ্রহণ করেছেন, দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমাদের অধিকাংশ সাংবাদিক-সহকর্মীরা মনে করেছিলেন যে বিজেপি কোনোভাবেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কেউ কেউ তো আরো এক কাঠি উপরে উঠে এটাও বলছিলেন যে এনডিএ ২২টি আসনের বেশি কোনো ভাবেই এগোবে না। এমনটাই ছিল ‘অতি উদারনৈতিক’ তথা বামপন্থী বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকদের ধারণা। কিন্তু সমস্ত ধারণায় জল ঢেলে দিয়ে এবারে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি যে সাফল্য পেয়েছে তা রীতিমত গান্ধী পরিবারের ভক্তদের কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে। তবে সারাদেশ ব্যাপি এই যে মোদী ঢেউ উঠেছিল তার লক্ষণ আমি বছর খানেক আগেই দেখেছিলাম। সাংবাদিকতার সূত্রে রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে যাওয়ায় সেখানেই মোদী ঝড়ের প্রথম পূর্বাভাস পাই। রাজস্থানের ওই গ্রামাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ভারতে পরিবর্তনের কাণ্ডারি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রূপে মোদীকেই দেখতে আগ্রহী। কংগ্রেসের দশ বছরের শাসনে অনুন্নয়নের এই অন্ধকারে একমাত্র মোদীই দেখাতে পারেন আলো। কেন তারা মোদীকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান, সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার। অপরিশুদ্ধ জল, ভাঙ্গা রাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা, বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল, ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা থেকে একমাত্র মোদীর পক্ষেই সম্ভব প্রকৃত উন্নয়নের স্রোত নিয়ে আসা। সেই আশাতেই বুক বেঁধে তারা নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান। গোটা ভারতেই প্রায় সেখানেই গেছি সেখানেই দেখেছি মানুষ ঘুরে ফিরে দুটো হিন্দি শব্দই বলছে— পরিবর্তন আর বিকাশ। নির্বাচনী প্রচার শুরু'র পর উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ভুবনেশ্বর, কোচি কেরলকে বাদ দিলে প্রায় যে রাজ্যেই গেছি সেখানেই চলছিল মোদী হাওয়া। কিন্তু এতসব দেখে যখন দিল্লীতে আমার সাংবাদিক সহকর্মীদের কাছে ফিরে গিয়ে জানালাম

তখন রীতিমতো তাঁদের নিজেকে একজন মোদীপন্থী বলে চিহ্নিত ও হতাশা হতে হলো। একমাত্র ব্যতিক্রম রজত শর্মা, এছাড়া আর কোনো সাংবাদিকই এবারকার সাধারণ নির্বাচনের ফল কি হতে চলেছে সে বিষয় সঠিক মূল্যাঙ্কন করতে পারেননি। রজত শর্মা যেহেতু নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আগেভাগেই সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন এজন্য তাঁকেও সাংবাদিক হিসেবে মোদীপন্থী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছিল। এই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার রাজত্বে যদি আপনি পরিবারতন্ত্র, ভণ্ড জাতপাতবাদী নেতা নেত্রী এমনকী স্ট্যালিনবাদীদের প্রতিও নিরলস আনুগত্য প্রকাশ করতেই পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি মনে করেন এই পিছিয়ে পড়া ভারতে মোদীই পারেন পরিবর্তন আনতে অমনি আপনাকে ‘সাম্প্রদায়িক’ তকমা দেওয়া হবে।

আসলে ড. মনমোহন সিংয়ের আর্থিক সংস্কার কিছু শ্রেণীর মানুষকে সচ্ছল করেছে আর নয়া মধ্যবিত্তের সৃষ্টি করলেও আপামর দেশবাসীর কোনো উন্নতিসাধন করতে পারেনি। শুকিয়ে গেছে চাকরী'র বাজার। অতিরিক্ত করভার আর লাইসেন্স রাজ লগ্নিকারীদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। কৃষি থেকে শিল্প কোনো ক্ষেত্রেই দেশকে দিশা দিতে পারেনি কংগ্রেস সরকার। তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় নেহরু গান্ধী পরিবারের প্রসাদপুষ্টরা বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে থাকবেন যে এবার দেশ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেশের যুব সমাজ নেহরু গান্ধী পরিবার আজ কংগ্রেসের অপপ্রচারকে অগ্রাহ্য করে মোদীকেই নিজেদের প্রধানমন্ত্রী দেখতে চেয়েছেন। নেহরুভিয়ান সমাজতন্ত্র, বড় বড় মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা আর জাতপাতের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে মোদীর ‘সবকা সাথ— সবকা বিকাশ’ মন্ত্রেই আস্থা রেখেছে দেশ। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, যারা অত ইংরেজি বোঝেন না তাদের কাছে কংগ্রেসের বড় বড় বুলি নিছক অর্থহীন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটা বিরাট অংশের যুবসমাজ বিকাশের স্বার্থে মোদীকেই চেয়েছেন। আর এখানেই নরেন্দ্র মোদীর কৃতিত্ব। দেশের যুব সমাজের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের অপদার্থতাকে সঠিক ভাবে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই নিজের প্রতিও জনতার বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন। হ্যাঁ, তিনি নরেন্দ্র মোদী, যাঁর অস্তিত্ব ছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির এই সাফল্য অধরাই থেকে যেত। আজ যাঁরা মোদীর আগমনে ত্রিশ দশকের ইউরোপের প্রেক্ষাপটে ভারতের শেষের শুরুর জলপনা করছেন তাঁরা নিজেদের নিশ্চিত ভাবে ইতিহাসের ভুল পথে চালিত করছেন।

(সৌজন্যে : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্তি

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! ৬৭টি বছরের কংগ্রেসী জোয়াল থেকে মুক্তি কী কথায় ব্যক্ত করা যায়! আজ মুক্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে গাইতে মন চায়—

তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ওই নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বৈশাখীর ঝড়।

আজ আর মিন মিন কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' নয়, মুক্তকণ্ঠে প্রাণ উজাড় করে গাওয়ার দিন :

বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং, মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্লু-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্
বন্দেমাতরম্।

মায়ের মুখে হাসি ফুটেছে। দীর্ঘ ৬৭ বৎসর সেকুলারি অস্ত্রাঘাতে ভারতমাতা যেমন ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তেমনি মাতৃবন্দনা গীত বন্দেমাতরম্ গানটিও আমরা পূর্ণাঙ্গরূপে গাইতে পারিনি। ১৯৪৭ সালের খণ্ডিত স্বাধীনতা আমাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ম্লান করে দিয়েছে। পেশোয়ার থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর ভারতে বইছে রক্তনদী, চলছে অবাধে মা-বোনের ইজ্জতহানি। কেউ আমাদের ডেকে বলার নেই যে— হে হিন্দু যুবকবৃন্দ! তোমরা কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়াও, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা কর, মাতৃভূমির খণ্ডীকরণ ঠেকাও।

উল্টে, আমাদের গাইতে বাধ্য করা হয়েছে :

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম"—গাইতে।

অবশেষে ধর্মের কল বাতাসে নড়ল। উদয় হলেন নর-কেশরী নরেন্দ্র মোদী— পবিত্র গুজরাট ভূমির মাটি থেকে। যে গুজরাটের বুকে সতেরবার বিধ্বস্ত (১০০৯-১০২৬ খৃস্টাব্দ) সোমনাথ মন্দিরটি বারংবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গুজরাটবাসীর অজেয় মনোবল, স্বধর্মনিষ্ঠা হিন্দুত্ব চিন্তাভাবনাকে ইসলামী বর্বরতা দমিত করতে পারেনি— সে মাটি থেকে তো উদ্ভব হতে পারেন নর-কেশরী নরেন্দ্র মোদী।

যা ঘটে গেল তাকে কি বলা যায়? হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, জাতীয় জাগরণ! কোনও কিছুর সঙ্গেই এই প্রত্যাঘাতের তুলনা চলে না! একে "মোদী-কম্প" বলাই সঙ্গত। বাপ্‌রে বাপ্। আসমুদ্র হিমাচল ওলটপালট করে দিয়ে গেল। যুদ্ধবিধ্বস্ত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের দৃশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয় :

'রথি, মহারথী সব যাইতেছে গড়াগড়ি ধুলায়। কোথায় রাজছত্র, কোথায় হস্তী, অশ্ব, রথাদি বাহন, তাদের চালকগণ!' আধুনিক কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে দেখা গেল হেলিকপ্টার মুখ থুবড়ে পড়েছে, দিশি-বিদেশি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চক্রযানগুলি রাস্তার পাশে গোত্তা খেয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের চালক বাহক গালগোল মালিকগণ গায়ের ধুলো ঝাড়তে, কাছা কোঁচা সামলাতে ব্যস্ত। দু' চোখে আঁধি লাগায় চোখে অন্ধকার দেখছে। অনেক নির্বাচন দেখেছেন। পান চিবুতে চিবুতে হেলায় লঙ্কা জয় করেছেন। কিন্তু মোদী-সুনামিতে থর মরুভূমির সমস্ত বালুকারাশি যেন আগাপাছতলা সব ঢেকে দিয়ে গেল। আত্মপরিজন কে যে কোথায় ছিটকে গেল— তাদের খুঁজে পাওয়াই মুশকিল!

আসমুদ্রহিমাচল কথাটা অত্যন্ত হাল্কাভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়! কিন্তু পত্রপত্রিকায় যে ভোট চিত্রাবলী প্রকাশিত হচ্ছে তার দিকে তাকালেই বক্তব্য বোধগম্য হয়। সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গৈরিক রঙের ছোপ। অর্থাৎ ওই আসনটি বিজেপির দখলে। মূল ভূখণ্ডের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারিকা (বিবেকানন্দপুরম্ ও বিবেকানন্দ শিলা সমেত) আসনটিতে পদ্মফুল ফুটেছে এইবারে। সর্বোত্তরে জম্মু-কাশ্মীরের জম্মু প্রদেশের তিনটি আসনই বিজেপি-র ঝুলিতে। আরব সাগরের বুকে গোয়া-দমন-দিউ-দাদরা-নগর হাবেলি— সব কটি আসনেই পদ্মফুল ফুটেছে। তারপর গুজরাট থেকে অসম হয়ে নেফা পর্যন্ত তো গৈরিক পতাকার পত্‌পত্ ধ্বনি ও বিকশিত কমলে ছয়লাপ।

একমাত্র ব্যতিক্রম সুদূর অতীতে বর্তমান কেরলের কালিকট বন্দরে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে আগত ওলন্দাজ ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের বংশধরদের দ্বারা অধ্যুষিত কেরল রাজ্য। যা বর্তমানে খৃস্টান নষ্টামি ও ইসলামি দুষ্টামির কেন্দ্রস্থল হিসাবে গণ্য— তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক কম্যুনিস্ট ভ্রষ্টামি। আশার কথা কন্যাকুমারিকায় যখন কমল বিকশিত হয়েছে, সেখান থেকে কেরলের সীমানা খুব বেশি দূরে নয়। হিন্দুত্ব ও জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য বিবেকানন্দশীলার বাতাস কি কেরলে গিয়ে পড়বে না! সে সুদিনের আশায় আছি।

কর্ণাটকে ইয়েদুরাপ্পার সঙ্গে বোঝাপড়ার ফল তো হাতে হাতে পাওয়া গেল। ওড়িশায় খৃস্টান নবীন পটনায়কের পটল তোলারও আর দেরী নেই। মহাপ্রভুর কৃপায় পুরীধামও বিধর্মী শাসনমুক্ত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না। যে বৃথা আশার ছলনায় ভুলে সোনিয়া গান্ধী অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ করে তেলেঙ্গানা রাজ্য গড়লেন, সে গুড়েও একরাশ বালি। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি জয়লাভ করেই সোনিয়া গান্ধীকে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে দিল। কংগ্রেসের আমও গেল ছালাও গেল।

এই নির্বাচনের দু'টি শিক্ষা ও অবদান কখনো ভোলার নয়।

১। গুজরাটের মাটি থেকে উদ্ভূত গুজরাটী গান্ধীর অহিংস মতবাদ তথা গান্ধী নেহরু যুগের চিরসমাধিলাভ, বংশগত শাসন ব্যবস্থার ও সেকুলার নামক হাঁসজারু নীতির অবসান। আর—

২। যে গুজরাট থেকে বিধর্মী শাসন সারা ভারতে প্রসার লাভ করে সেই গুজরাট থেকেই ইসলাম প্রভাবান্বিত সেকুলার শাসন থেকে ভারতের মুক্তিলাভ ঘটল। ঐতিহাসিক তাৎপর্য নয় কী। বন্দেমাতরম্।। ভারত মাতা কী জয়।।

ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ : নরেন্দ্র মোদীর বিজয়পর্ব

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

বাংলা ১৪২০ সালের বৈশাখ মাসের শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলা স্থাবর-অস্থাবর স্রষ্টা ব্রহ্মার দরবারে চাঁদের হাট। বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, যম, গণেশ, কার্তিক অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু, অগ্নি-সহ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, উর্বশী, তিলোত্তমা, ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত দেবদেবী গন্ধর্ব কিন্নর উপস্থিত। তাঁরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন নারদের জন্য। ব্রহ্মা নারদকে ভারতে পাঠিয়েছেন। বুধবার সারা ভারতে ভোট পর্ব শেষ হয়েছে। আজ সকাল থেকে প্রতিটি রাজ্যের ব্যালট পেপার গণনা হচ্ছে। নারদ ভোটের ফলাফল নিয়ে আসবেন। এর আগে ব্রহ্মা নারদকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন। নারদ বিভিন্ন সূত্র থেকে যে খবর এনেছিলেন তাতে প্রায় স্পষ্ট হয়েছিল যে মোদী—নরেন্দ্র ভাই মোদী—জিতছেন। তবু সবাই চূড়ান্ত খবর জানার জন্য উদগ্রীব।

ব্রহ্মা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। ছটা বাজল, সাড়ে ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটাও বেজে গেল। মহাদেব রেগে গেলেন। ব্রহ্মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ''জয় ব্রহ্মা'' বলে নারদ প্রবেশ করলেন। সবাই নারদের মুখ থেকে নির্বাচনের সংবাদ শোনার জন্য তাঁর দিকে বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইলেন। নারদ উপবেশন করতে করতে বললেন, ''অনেক আগেই আসতাম, কিন্তু আমার ঢেঁকিটার একটা পাটা ভেঙে গিয়েছিল। সেটা সারাতে দেরি হয়ে গেল।'' ব্রহ্মা বললেন, ''ঠিক আছে। আগে আমাদের ভারতের খবর বল।''

নারদ তাঁর কমণ্ডলুটা এক পাশে রেখে দাঁড়িয়ে বললেন, ''হে বিশ্বস্রষ্টা, আমি আগের বারে এই বুধমণ্ডলির সভায় যা ফোরকাস্ট করেছিলাম তাই ঘটেছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী অপ্রত্যাশিত রকম বহু ভোট পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।''

নারদ-মশাইয়ের কথা শেষ না হতেই সভায় সকলে প্রবল উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তাঁরা ব্রহ্মাকে ঘিরে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ''অব কি বার মোদি সরকার''। আনন্দের উত্তেজনায় ইন্দ্র উর্বশীকে, সূর্য তারাকে নিয়ে নাচতে লাগলেন, শিব বাঘছাল পরা অবস্থায় তাঁর গলায় জড়ানো অজগরদের ডান হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। আনন্দ উল্লাস থেকে কাউকে বিরত করা যাচ্ছিল না। শেষমেশ ব্রহ্মা হাল ধরে বললেন, ''খামোশ, স্টপ রাউডিসম, আমি এসব বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করব না।'' তারপর নারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''হ্যাঁ, নারদ, মোদীর দল কত ভোট পেয়েছে, এনডিএ কত পেয়েছে, কংগ্রেসের খবর কি? দিদির হাল কি? আম্মাই বা কত ভোট পেয়েছেন এসব আমাকে পরিষ্কার করে বল।''

নারদ পাশে রাখা কমণ্ডলু থেকে এক ঢোক জল খেয়ে বললেন, ''হে বিশ্বস্রষ্টা, বিজেপি একাই ২৮২টি আসন পেয়েছে। ২৭২ হলো ম্যাজিক নাম্বার। বিজেপি এই ম্যাজিক নাম্বারের থেকে ১০টি বেশী আসন পেয়েছে। মোদী ভাইয়ের সরকার গড়তে কারোর সাহায্যের দরকার হবে না, তবু মোদী এনডিএ-কে সঙ্গে নেবেন। এনডিএ পেয়েছে মোট ৩৩৬টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৪৪টি আসন— যা কখনো হয়নি। কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে পেয়েছে ২টি আসন যা কখনো স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। বিজেপি-তে একজনও মুসলমান জিতে আসতে পারেনি। সংসদে মোট ২২টি আসন মুসলমানদের দখলে। সমাজবাদী পার্টি, বহুজন পার্টি প্রায় নিশ্চিহ্ন। অবশ্য কয়েকটি আঞ্চলিক দল আশাতীত রকমের ভালো ফল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে দিদির তৃণমূল পার্টি ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি আসন পেয়েছে। আম্মাও তাঁর দাপট অক্ষুণ্ণ রেখেছেন— ৩৯টির মধ্যে ৩৭টি আসন পেয়েছে। ওড়িশার নবীন পট্টনায়কের দল মোট ২১টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ২০টি আসন। একটা উল্লেখযোগ্য খবর হলো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ২টি আসন পেয়েছে এবং এতে দিদির কপালে ভালো রকমের ভাঁজ পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভোট পাওয়ার হার হলো ১৭ শতাংশ। উপস্থিত সবাই আবার আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন।

ব্রহ্মা নারদকে প্রশ্ন করলেন, ''দিদির এক দিকে জয় অন্য দিকে হার— এই পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতিতে তাঁর অবস্থান কি?'' নারদ কমণ্ডলু থেকে আবার এক ঢোক জল খেয়ে বললেন, ''কর্তা, তিনি ২০১৬ সালের রাজ্য নির্বাচনে যাতে এরকমই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখতে পারেন সেই অঙ্ক মাথায় রেখে কাজ করছেন। উনি আম্মা, নবীন পট্টনায়কদের সঙ্গে জোট বাধার চেষ্টা করবেন।''

ব্রহ্মা গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, সকলে তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মা বললেন, ''আমি নরেন্দ্রভাইকে নির্বাচনে অসাধারণ ফল করে সরকার গঠন করার জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাব।'' তারপর গণেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''গণেশ এসো, এখনি ডিক্টেসন নাও।''

লেখ— মোদী ভাই, আপনি আপনার অসাধারণ ক্ষমতা বলে বিজেপি দলকে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। আপনাকে আমার উপদেশ— আপনি কোনোমতেই বিজেপি-র আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন না। রাম-মন্দির নির্মাণ, ৩৭৪ ধারা বিলোপ, অনুপ্রবেশ আটকানো, ইমাম ভাতা-হজ অনুদান বন্ধ, পাকিস্তানকে চাপে রাখা প্রভৃতি যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি আপনি সমস্ত বাধা চূর্ণ করে রূপায়িত করবেন। মনে রাখবেন এবং যা আপনি কাজ করে দেখিয়েছেন— স্বধর্ম আচরণের বিকল্প নেই।'' ব্রহ্মা উপস্থিত সমস্ত সভাসদদের উদ্দেশে বললেন, ''আমার এই শুভেচ্ছা বার্তা সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলার আছে?'' সবাই সমস্বরে বললেন, ''না, না''।

ব্রহ্মা তখন নারদকে বললেন, ''যাও নারদ, আমার এই শুভেচ্ছাবার্তা মোদীজীকে দিয়ে এসো।'' নারদ কমণ্ডলু থেকে আবার এক ঢোক জল খেয়ে ঢেঁকি চড়ে পৃথিবীর দিকে পাড়ি দিলেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হলে তো ভারতের অধিকাংশ মানুষ সাম্প্রদায়িক

প্রবীর ঘোষ

যে-কোনো রাজনৈতিক নির্বাচনের (লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত...) আগে বা পরে রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো ছোট দল বা সর্বভারতীয় (অর্থাৎ বড়) রাজনীতিক দলের বিরুদ্ধে 'যা খুশি তাই'— কি বলা যায়? গঠিত; কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ একক বা একজন। একজন মানুষের বিরুদ্ধে বা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে 'যা খুশি তাই বলা' আর সর্বভারতীয় একটি দল বিজেপি-র বিরুদ্ধে 'যা খুশী তাই বলা'— কি এক হতে পারে? বিজেপি-কে যারা অপছন্দ করেন সেইসব মানুষ ও বিরোধী রাজনীতিক দল, তাদের প্রচারের দাক্ষিণ্যে 'দুটি

বিজেপি-কে তাদের বিরোধী প্রায় সব রাজনীতিক দলই, বিজেপি-কে 'সাম্প্রদায়িক দল' হিসাবে লাগাতার প্রচার করে থাকেন। প্রচারের ঠ্যালাটা এমনই, সেই গল্পটির মতো, জনৈক মানুষের কাঁধে উঠে যাওয়া সত্যিকারের ছাগলের বাচ্চাটিকে দেখে, পথচলতি মজাদার বা ঈর্ষাকাতর বা বিরোধী কিছু মানুষ, 'শুয়োরের বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছ কেন' পরপর এমন কথা বলে-যেতে-থাকায়, শেষোক্ত মিথ্যে কথাটাই যেন সত্যিতে পরিণত হয়ে যায়— প্রচারের এমনই মহিমা বা দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার মতো। দল বা প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী... অ-নে-ক মানুষকে নিয়ে

বাণী' প্রায় সত্যিতে পরিণত করে ফেলেছেন, তাহলো : (১) বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল (২) নরেন্দ্র মোদী দাঙ্গাবাজ, তাঁর হাতে রক্তের দাগ। এবারে আসা যাক, ওই জাতীয় বক্তব্যের উত্তরের দিকটি। ২০০৯-এর পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে অর্থাৎ বিগত লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আসন পেয়েছিল ২০৫টি। আর ১১৬টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। তাহলে এই ১১৬টি আসনে যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেয়ে বিজেপি-র প্রার্থীরা জয়ী হলেন, সেই ভোটদাতাগণ তো সকলে সাম্প্রদায়িক?! পরাজিত বিজেপি-প্রার্থীরাও যারা অনেক-অনেক ভোট পেয়েছেন— যার যোগফল কয়েক কোটি, সেইসব ভোট-দাতারাও সকলে সাম্প্রদায়িক? তা কি সত্যি হতে পারে? সিপিএম একদা যখন নির্বাচনে পরাজিত হলো পশ্চিমবঙ্গে, জ্যোতিবাবু আর নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন— 'জনগণ ভুল করেছে' অর্থাৎ সিপিএম প্রার্থী জয়ী হতে না পারায় জনগণ ভুল করেছে। বাহাত্তুরে বুড়োর মতো বাণী দিয়েছেন, আশি বছর বয়স পেরিয়ে গিয়েও। এঁরা নাকি গণতান্ত্রিক-নেতা শুধু নয়— সর্বভারতীয় নেতা— যারা একসময় বলত : চীনের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হলেন তোজোর কুকুর, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া-কবি— এরকম হাজারো 'প্রণম্যবাণী' আছে, যা আমৃত্যু স্মরণে রাখার মতো। এবারে আসি, নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কে। সমগ্র ভারতবর্ষে আজ যে-মানুষটি, রাজনীতিক-সচেতন প্রায় সকল ভোটারদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, আগামী দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন যিনি (২৬ মে সন্ধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন) সেই নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সম্পর্কে কংগ্রেস-মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন, বিজেপি-র অর্থ ভারত (বি) জ্বালাও (জে) পার্টি (পি), আর মোদী (Modi) অর্থে ম্যান (M) অব (O) ড্যামেজ (D) টু ইন্ডিয়া (I), গুজরাটের পরপর তিনবার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী— যে দাঙ্গাবাজ বা তিনিই দাঙ্গার পক্ষের নায়ক—এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা রায় (কোর্টের) কোনো আদালতই দেয়নি। এমনকী কংগ্রেস-শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার, যাদের দু-চোখের বিষ নরেন্দ্র মোদী এবং সিবিআই কেন্দ্রীয় সরকারে অধীন ও পরিচালিত, সেই সিবিআই-ও মোদীকে দোষী সাব্যস্ত করেননি; দাঙ্গা-বাঁধানোর সামনে বা পেছনে মোদীরই হাত ছিল, এমন কোনো প্রমাণ মেলেনি, আদালত বলেনি। শুধু শুধু এঁড়ে তর্ক করলে হবে কেন! যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে

যুক্তি বা সঠিক তথ্য দিয়ে খণ্ডাতে হবে বা প্রমাণ করতে হবে। নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে প্রবাসের একজন অরাজনীতিক বিখ্যাত লেখক ও বক্তা পশ্চিমবঙ্গের একটি পত্রিকায় যা লিখেছেন তা এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

''মোদী দোষী কি নির্দোষ সে-বিষয়ে যাচ্ছি না। প্রশ্ন করছি— দাগী নেতাদের ক্ষেত্রে এক নীতি, মোদীর ক্ষেত্রে অন্য নীতি কেন?

আর কম্যুনেল? 'কম্যুনেল্' (সাম্প্রদায়িক) গুজরাটে গত দশ বছরে কোনো দাঙ্গা হয়নি। অথচ 'সেক্যুলার' সমাজবাদী পার্টি শাসিত উত্তরপ্রদেশে গত দেড় বছরে একশ'র বেশি দাঙ্গা হয়েছে। তাহলে মুসলমানেরা কোথায় বেশি সুরক্ষিত?

'সেকুলার' সমাজবাদী পার্টির আরো খবর শুনুন। উত্তরপ্রদেশে গদিতে বসেই আতঙ্কবাদের অভিযোগে গ্রেপ্তার—লোকদের জেল থেকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল এই পার্টি। আদালত আপত্তি তুলেছে। মায়াবতীর আমলে ধৃত এই লোকেরা অধিকাংশই মুসলমান। দ্বিতীয়বার—মুজঃফরপুর দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের পাঁচ লাখ করে টাকা দিতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার। আদালত নির্দেশ দিয়েছে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদেরও সাহায্য করতে এরকম টাকা দিয়ে। তৃতীয় খবর—দাঙ্গার পর সরকার হিন্দু এলাকাগুলিতে অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়েছিল। আদালত নির্দেশ দিয়েছে এভাবে মুসলিম এলাকাগুলি থেকেও অস্ত্র উদ্ধার করতে। উপরের এই তিনটি খবরের তাৎপর্য কি? এটাই কি সেক্যুলারিজম্?

আরও খবর শুনুন। সারা ভারতে গ্রামবাসী মুসলমানদের মধ্যে গরীবি সবচেয়ে কম গুজরাটে (৭.৭ শতাংশ)। 'সেক্যুলার' কংগ্রেস শাসিত বড় রাজ্যগুলিতে এই হার প্রায় চারগুণ বেশি— মহারাষ্ট্র (২৮.৬), কর্ণাটক (৩০), অসম (৪০.২)। আরেক 'সেকুলার' সমাজবাদী পার্টি শাসিত উত্তরপ্রদেশে এই হার ৩৪ শতাংশ, নীতীশ কুমারের বিহারেও ৩৪ শতাংশ। আর পশ্চিমবঙ্গে ২৪ শতাংশ। এই রিপোর্ট তেণ্ডুলকর কমিটির।

এখন চমকপ্রদ কয়েকটি খবর। বিভিন্ন রাজ্যের কারাগারগুলিতে (জেল) যত মুসলমান কয়েদী আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে কম গুজরাটে। আরেকটি ইন্টারেস্টিং খবর শুনুন। আমেরিকান ও বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন জাফর সরেসওয়ালা, যাতে মোদীকে ভিসা না দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক আদালতেও মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। আজ এই জাফর সাহেব হলেন মোদীর খুব কাছের মানুষ। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মোদীর কাছে নিয়ে আসতে তিনি এক বড় ভূমিকা নিয়েছেন। গত সেপ্টেম্বরে মোদীর জন্মদিনে প্রকাশ্য সভায় মোদীর উপস্থিতিতে বহু মুসলমান ভদ্রলোক বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। গত নির্বাচনে গুজরাটে ২৫ শতাংশ মুসলমানের ভোট পেয়েছিল এই পার্টি। আরেকটি খবর— আমেদাবাদের বিখ্যাত মুসলমান ব্যবসায়ী জাকির হোসেন (৮ রেস্টুরেন্ট ও ২ হোটেলের মালিক তাঁর পরিবার) সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি বলেছেন : 'আমি মোদীকে পছন্দ করি না, কিন্তু তাকেই ভোট দেবো।' এমন কথা কেন? তিনি বলেছেন, 'রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা খুব ভাল, আমরা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারছি, মুসলমানদের প্রতি কোনোরকম সরকারি বৈষম্য নেই।' বস্তুত, গুজরাটের মুসলমান-ব্যবসায়ী মহলে মোদী জনপ্রিয়। বিখ্যাত সংস্থা দেওবন্ধ মুসলিমদের অধ্যক্ষ প্রকাশ্যেই বলেছেন : 'মোদী অছ্যুৎ নন।' টিভির এক ইন্টারভিউতে তিনি চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেছেন— 'গুজরাট দাঙ্গায় অনেক কংগ্রেসী যুক্ত ছিলেন।'

উত্তর আর বড় করবো না। একটি অনুরোধ— অহেতুক অন্ধ ভক্তি ভালোবাসা না দেখিয়ে, এবার আপনারা একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখবেন, নিজে বিশ্লেষণ করবেন। গুজব বা যুক্তিহীন বা প্রচুর মিথ্যাবাণী শুনে পাগল বা অপাগল হবেন না!

তথ্য : *প্রশ্নোত্তরে সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টা। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ । বর্ণালী, বসিরহাট। ৪২ বর্ষ। ১ম সংখ্যা ২০১৪, ১২২।*

(লেখক : সম্পাদক, বর্ণালী পত্রিকা)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ : দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

ভারতের হিতে ভারতীয় হিন্দুদের যুদ্ধে নামতে হবে

অমলেশ মিশ্র

'সব ধর্মই এক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা'— এই দুটি ধারণা (concept) সমার্থক নয়। একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। 'সব ধর্ম এক' হোক অথবা না হোক, ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনায় আবশ্যিক। দেশকে দাঙ্গা বা হিংসামুক্ত করতেও ধর্মনিরপেক্ষতা বাধ্যতামুলক। ভারতবর্ষে এযাবৎকাল ঘটে যাওয়া হাজার হাজার দাঙ্গার পিছনে মূল কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ধারণার (concept) বয়স এক হাজার বছরও নয়। অপরদিকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 'নিরপেক্ষতা'র ধারণা কয়েক হাজার বছরের পুরানো। সে যুগে অন্যান্য রিলিজিয়ন জন্ম না নেওয়ায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিরও জন্ম হয়নি। কিন্তু নিরপেক্ষতা বিষয়টি তার গূঢ় অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করত।

নিরপেক্ষতা, ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ। নিরপেক্ষতা রিলিজিয়নের আবশ্যিক অঙ্গ নয়। মহাভারতে ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ বারংবার নিরপেক্ষতা- রূপ ধর্মের কথা বলেছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও রাজধর্মে নিরপেক্ষতার আবশ্যিকতা স্বীকৃত।

নিরপেক্ষতা অর্থে সমান অধিকার ও সমান বিচার। কাউকে অন্যায্য ভাবে বিশেষ সুবিধা বা শাস্তি দান নয়। নিরপেক্ষতা 'ন্যায়'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই হিন্দু চিন্তনে ন্যায় ও নিরপেক্ষতা ধর্ম-এর অঙ্গ। পক্ষপাতিত্ব অন্যায়, সেহেতু অধর্ম ও নিন্দনীয়।

ইহুদী, খৃস্টান, ইসলাম ইত্যাদি রিলিজিয়ানগুলি 'নিরপেক্ষতা'কে আবশ্যিক মানবিক ধর্ম বলে মনে করে না। নিজ নিজ রিলিজিয়নের বাইরের মানবাকৃতিদের তারা হীন মনে করে। তাই ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে নিজ নিজ রিলিজিয়নভুক্ত করে।

হিন্দু ভারতের অন্যতম মানবিক ধর্ম হলো— নিরপেক্ষতা— যা হিন্দুত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দুত্বের মধ্যে নিরপেক্ষতার যে ব্যাপকতা তার মূলে আছে হিন্দু দর্শনের একটি বিশেষ বিশ্বাস যে— মানুষ মাত্রেই অমৃতের পুত্র। তাই সমস্ত মানুষই সমান অধিকার ও সমান বিচার পাওয়ার হকদার। কোনো কোনো রিলিজিয়ন বলে যে মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু সেই ঈশ্বরের করুণা লাভ করতে হলে সেই মানুষকে ওই রিলিজিয়নে ধর্মান্তরিত হতে হবে। হিন্দুদর্শনে, ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য ধর্মান্তরিত হতে হয় না। ঈশ্বর তার রিলিজিয়ন বিচার করে করুণা করা বা না করা স্থির করেন না।

ভারতবর্ষে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক। তবু তাঁরা ভারতীয় দর্শনের এই নিরপেক্ষতার তাৎপর্যটাই গ্রহণ করেন না। একই অবস্থা এদেশের হিন্দু বিদ্বজ্জন এবং সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত হিন্দুদের। এরা দুটি গুরুতর ভুল করেন— (১) ধর্ম ও রিলিজিয়ন (আবর্তিত ও প্রবর্তিত) এর মধ্যে প্রভেদ করতে পারেন না। (২) ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে এরা সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণে বিশ্বাস করেন।

এই 'ভুল' এর পিছনে মূল কারণ এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই প্রাচীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠক্রমে হিন্দু ভারতের মূল্যবোধ বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত, অনুল্লেখিত বা বিকৃতভাবে উল্লেখিত। ফলে বক এবং কচ্ছপ পৃথকীকরণে অপারগ হয়ে বকচ্ছপ মূর্তি চাইছেন।

রাজনীতির লোকেরা এই 'ভুল' করেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল হিসাবে। অন্যরা এই 'ভুল' করেন অন্যের অলিখিত আদেশে— যা পালনে পার্থিব গৌরব— যশ অর্থ সম্মান প্রাপ্তি ঘটবে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে এই দেশটি সুদীর্ঘকাল পরাধীন— প্রথমে ইসলামীদের পরে খৃস্টানদের। এই দীর্ঘকাল সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যাঁদের দ্বারা তাঁরা রিলিজিয়ন বুঝতেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটি বুঝতেন না। এই সেমেটিক প্রভাবে প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে যারা বেরিয়ে এলেন 'শিক্ষিত' ছাপ নিয়ে তাঁরা এই সেমেটিক প্রচারের বাইরে যেতে পারলেন না। আর পারলেও গেলেন না কারণ সেমেটিক প্রভাবে প্রভাবিত থাকলে লাভ বেশি।

এর অব্যবহিত ফল দেখা যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির উপর। এই নিরপেক্ষতা সকলের সমানাধিকার আর সকলের প্রতি সমান বিচারে বিশ্বাস করে না। এই নিরপেক্ষতা বিশ্বাস করে রিলিজিয়ন গত ভাবে যারা সংখ্যালঘু তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক সুযোগ প্রদান। যে দলে যতবেশি সংখ্যালঘু থাকবেন, সে দল তত বেশি ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের হিসাবে মুসলিম লীগই সব থেকে বেশি ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ সে দলে শুধু সংখ্যালঘুরাই আছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিকৃত অর্থ সম্বল করেই এদেশে রাজনীতি হচ্ছে এবং রাষ্ট্রনীতিও। এটি ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতি— একে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে না। একই ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সুবিধা পাবেন আবার সংখ্যালঘু হিসাবেও সুবিধা পাবেন— এই তত্ত্ব চলতে পারে না। ধান্দাবাজ রাজনীতিকরা ক্ষমতার লোভে সংখ্যালঘুদের দু'রকম সুবিধা পাইয়ে দেওয়ায় তৎপর। এর বিরোধিতা করাকে এরা বলেন 'সাম্প্রদায়িকতা'। যে কোনো হিন্দু সংগঠনকে এরা সাম্প্রদায়িক বলেন। আর অহিন্দু সংগঠনগুলি এদের চোখে প্রণম্য কারণ সেগুলি ধর্মনিরপেক্ষ। এই সব বিকৃত চিন্তা ও স্বার্থবাদী রাজনীতি ৬৫ বছরে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এর বিরোধিতা করতে হবে দেশভক্তির খাতিরে। ভবিষ্যত প্রজন্মের খাতিরে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, বিদ্বজ্জন সমাজে এবং সংবাদমাধ্যমে প্রবেশ করতে হবে হিন্দুদর্শনে বিশ্বাসীদের। লড়াইতে নামতে হবে রাষ্ট্রভক্তদের। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতার এই বিকৃত বিচার ধারার মূলোৎপাটন করতে হবে। ভারতের অগ্রগতিকে নিরঙ্কুশ করতেই এই মূলোৎপাটন অবশ্য করণীয়।

‘প্লাটফর্ম জ্ঞানমন্দির’

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভাগ্যের পরিহাসে শিশুকালেই মা-বাবা, হাসি-আনন্দ সব কিছু হারিয়ে শুধু এক টুকরো রুটির জন্য রেল স্টেশনের এক প্লাটফর্ম থেকে আরেক প্লাটফর্মে দৌড়ে বেড়ায় অনেক শিশু। স্টেশনে যাওয়া-আসা রেলগাড়িতে করে তারা এক প্লাটফর্ম থেকে অন্য প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। একদিন সত্যিকারের ‘প্লাটফর্ম’ পেয়ে যায় নাগপুর রেল স্টেশনের কিছু হতভাগ্য শিশু। নাগপুর স্টেশনের পাশে ‘প্লাটফর্ম’ একটা পাঠশালার নাম। রেলপুলিশ এরকম হতভাগ্য শিশুদের খুঁজে এনে এই ‘প্লাটফর্ম’-এ জমা দেয়।

মহারাষ্ট্রের উপরাজধানী নাগপুর শহরে গীতাঞ্জলি টকিজের পাশে এই আবাসিক পাঠশালা। শিশুরা এখানে থাকে, পড়াশুনা করে ও খেলাধুলা করে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের শিক্ষাও দেওয়া হয়। তারা যাতে বড় হয়ে জীবনে সঠিকপথ খুঁজে নিতে পারে তার প্রেরণা দেওয়া হয়।

অজয়ের ঘটনাও প্রায় এরকমই। সেও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। তার বাবা তাকে সারাদিন জমিতে কাজের জন্য লাগাতো। ধান, গমের বড় বড় বস্তা পিঠে করে বইতে হতো। কাজ করার পরও পেটপুরে খাবার দিত না। মা একেবারে শিশুকালেই মারা গিয়েছে। স্নেহ, আদর দেওয়ায় কেউ ছিল না। সেও নাগপুর স্টেশনে ভিক্ষা করে খেত। পুলিশ তাকেও এই পাঠশালায় এনে ভর্তি করে। অজয় বলে, “জানোয়ারের মতো কাজ করেও খাবারের বদলে মারধোর জুটতো। তাই আমার বাড়ির চেয়ে এই পাঠশালাই ভাল। এই পাঠশালা আমার মা।”

এই পাঠশালার একজন অভিভাবক

জ্ঞানমন্দিরের শিশুরা একটি অনুষ্ঠানে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা।

রেলপুলিশ ও বিশ্ব হিন্দু জনকল্যাণ পরিষদ এই শিশুদের সংস্কারিত জীবনের শিক্ষা প্রদান করে তাদের অপরাধজগতে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে।

রবীন্দ্র সিংঘল নাগপুরে রেলওয়ে পুলিশ অফিসার ছিলেন। তিনি দেখতেন প্রজাপতির মতো সুন্দর সুন্দর শিশুরা খেলাধুলোর আনন্দে মশগুল থাকার বয়সে রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তিন বছরেরও ছোট আবার কেউ কেউ ছয়-সাত বছরের। তাদের কষ্টময় জীবন দেখে সিংঘলের হৃদয় ব্যথায় টনটন করে ওঠে। এই শিশুদের কষ্টকর জীবন থেকে উদ্ধার করে নতুন জীবনের স্বাদ দেওয়ার সংকল্প করেন। এর জন্য তিনি তৎকালীন মেয়র অর্চনা ডেহনকরের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মেয়র তার প্রস্তাবে খুশি হয়ে শহরে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। তারপরেই বিশ্ব হিন্দু জনকল্যাণ পরিষদের সহায়তায় এই পাঠশালা স্থাপনা করে নাম দেন ‘প্লাটফর্ম জ্ঞানমন্দির’।

এই পাঠশালায় ওয়াসিম ও অজয় নামে দুই বালকের যন্ত্রণাময় জীবনের ঘটনা এখানকার সমস্ত শিশুর জীবনের মতোই। নিজের জীবনের ঘটনা বলার সময় ওয়াসিম বলে, “একদম শিশুকালেই বাবা আমাকে মালবহার কাজে লাগিয়ে দেয়। একদিন কাজে একটু ভুল হওয়ায় বাবা আমাকে নির্দয়ভাবে মারে। মারের দাগ এখনো আমার পিঠে আছে। আমি পালিয়ে নাগপুর স্টেশনে আসি। এখানে ভিক্ষা চেয়ে দিন কাটতো। একদিন রেলপুলিশ ধরে নিয়ে এসে এই পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়। এখন আমি সম্মানের সঙ্গে বড় হচ্ছি। আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।” উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সময়ও শৈশবের কষ্টময় জীবনের কথা বলার সময় ওয়াসিম কেঁদে ফেলেছিল।

শ্রীকান্তজী বলেন, “এটা শিশুদের শুধু পাঠশালা নয়, তাদের নিজের বাড়ি। এরা যখন প্রথম এখানে আসে তখন এদের স্বভাব অন্যরকম ছিল। ধীরে ধীরে স্নেহ- ভালোবাসায় সংস্কারিত হয়ে একেবারে ভালো ঘরের ছেলে-মেয়েদের মতো হয়ে গেছে। সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে, যোগ-প্রাণায়াম করে, তারপর পড়তে বসে। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বাবা-মার কথাও বলতে পারে না। এরা সবাই এখানে নিজের ভাই-বোনের মতো থাকে।” শ্রীকান্তজী মানুষের কাছে আবেদন রেখেছেন— “এখানে এসে বাচ্চাদের পড়াতে পারেন। বই-পত্র, কাপড়-চোপড় দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। নিজের বাড়ির আনন্দ-অনুষ্ঠানের দিন এদের মধ্যে উৎসব পালন করতে পারেন। এর মধ্যে যদি কিছুই না পারেন, তবে কিছু সময় এদের মধ্যে কাটিয়ে যান, তাদের আনন্দ দিন।”

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

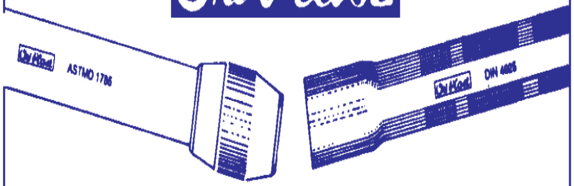

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতীয় সংস্কৃতির একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দুরা কখনও নিম্নতর জাতিসুলভ নৈতিক মান বা তাদের আদর্শ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়নি। এই সত্যটি সেই সৌভাগ্যের সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই শক্তিতেই ভারতকে আবার জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

লিভারের নানা সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থ সারথী মল্লিক

আমাদের পেটের ডানদিকের ওপরের অংশে থাকে লিভার বা যকৃৎ। এর দু'টি অংশ— একটি বামদিকের অংশ অন্যটি ডানদিকের। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে এই দু'টি অংশ আবার চারটি আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত।

লিভারের কাজ :

মূলত অস্ত্র থেকে শিরার রক্তের মাধ্যমে (ভেনাস ব্লাড) সমস্ত শোষিত খাবার লিভারে এসে পৌঁছায়। এরপর লিভার এই খাবারকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। উৎপন্ন হয় শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি (এটিপি)। এই শক্তি লিভারেই সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজনমতো শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয়। লিভার একটি ছাঁকনির মতো কাজ করে। অন্ত্র থেকে শোষিত বিষাক্ত পদার্থ, যা রক্তের মাধ্যমে লিভারে প্রবেশ করে তাকে আর শরীরে সঞ্চারিত করতে দেয় না।

শরীরের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, অ্যালবুমিন, যা স্বাভাবিক রক্তচাপ ধরে রাখতে ও রক্তের মধ্যে জলীয় পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। শরীরের লিভারজনিত সমস্যার কারণে অ্যালবুমিন কমে গেলে পেট ফোলা ও পেটে জল জমে প্রাণও যেতে পারে।

শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য যেসব বিশিষ্ট কোষ কাজ করে তাদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি স্থল এই লিভার। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লিভারের রোগীদের যে কোনো অসুখে সেরে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। রক্ত জমাট বাঁধার কাজে প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরগুলি সবই লিভার থেকে উৎপন্ন হয়। সেই জন্য অসুস্থ লিভারের রোগীদের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত লিভারের রোগীদের এই রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে রক্ত জমাট বাঁধার সময়, বাঁধার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তা দেখেও লিভার কতটা খারাপ হয়েছে তা বোঝা যায়। লিভার থেকে পিত্তরস তৈরি হয় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্নেহজাতীয় পদার্থ পরিপাকে পিত্তরস প্রধান ভূমিকা নেয়। পিত্তরস বেরোনোর রাস্তায় পাথর জমে, ক্যানসারে আক্রান্ত বা প্রদাহের ফলে সরু হয়ে আটকে গেলে শরীরে অবস্ট্র্যাকটিভ জন্ডিস দেখা দেয়। এর ফলে বিলিরুবিনের পরিমাণ

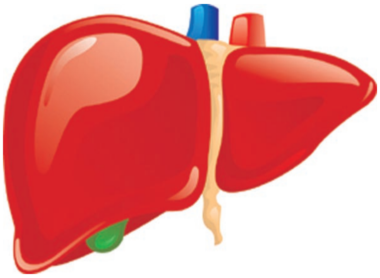

বাড়তে পারে। বাইরের অংশ হলুদ হয়ে যায়। এবং এই ব্যাপারটা সাদা চোখেই বেশি ধরা পড়ে।

এই সমস্যার সঠিক চিকিৎসা না হলে রোগীর অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। বাইল অ্যাসিড শরীরে জমতে থাকলে একটা সময়ের পরে তা লিভার কোষের পর্দা বা মেমব্রেনকে ফুটো করে কোষের মৃত্যু ঘটায়। বিলিরুবিন কুড়ি থেকে পঁচিশের ওপর উঠলে তা মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে এনকেফ্যালোপ্যাথি তৈরি করে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী প্রথম দিকে জটিল মানসিক কাজ করতে পারেন না। চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে রোগী এরপর একটা ঘোরের মধ্যে চলে যান। এবং একসময় সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

লিভারের কিছু জন্মগত সমস্যার কারণেও নানা উপসর্গ তৈরি হয়। যেমন লিভারের সিস্ট, পিত্তনালির বিভিন্ন অংশ ফুলে বিকৃত হয়ে যাওয়া বা পিত্তনালির কিছু অংশ সম্পূর্ণ ফাঁকা না হওয়ায় এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। একে বিলিয়ারি অ্যাট্রেশিয়া বলে। এসব ক্ষেত্রে জটিল অপারেশনের মাধ্যমে অন্ত্রের সঙ্গে এইসব অস্বাভাবিক নালির সরাসরি যোগ করে দেওয়া হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে লিভার প্রতিস্থাপনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তবে প্রতিস্থাপন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা। তাছাড়া দাতা লিভারের জোগানের ব্যাপারে ভারত সরকারের কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচি বা পরিকল্পনা নেই। অবশ্য দিল্লী, চেন্নাই ও হায়দরাবাদের কয়েকটা কেন্দ্রে গত কয়েক বছরে প্রায় চার-পাঁচশো রোগীর লিভার প্রতিস্থাপন হয়েছে এবং তার ফলও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

কিন্তু পূর্ব ভারতে মোট পাঁচটি এই ধরনের অপারেশন হয়েছে। এর মধ্যে দু'জন রোগী ভালো আছেন।

মূলত দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন, বোঝা যায়, অর্থাৎ তাঁর ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশ কৃত্রিমভাবে সচল রয়েছে এই অবস্থায় সেই ব্যক্তির পরিবার চাইলেই তাঁর লিভার অন্য রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে পূর্ণ লিভার প্রতিস্থাপন করা যায়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে পূর্ণ লিভার প্রতিস্থাপন করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে শিশুদের প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রে তার ইচ্ছুক বাবা-মা'র লিভারের একটা অংশ নিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়।

লিভার প্রতিস্থাপনের পর রোগীর পরিবারকে আবার একটা বড় খরচের ধাক্কা সামলাতে হয়। রোগীর শরীর যাতে প্রতিস্থাপিত, নতুন লিভারকে গ্রহণ করে তার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ ওষুধ খেতে হয়। তাই এই প্রতিস্থাপন এখনও সাধারণের নাগালের মধ্যে আসতে পারেনি।

কিন্তু লিভারের ৮০ শতাংশ সমাধান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে সম্ভব।

(লেখক 'ওয়ার্ক ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি'র সম্পাদক)

মেদিনীপুরে সংস্কৃত শিবির

মেদিনীপুর শহরের সিপাহী বাজারের শিশু মন্দিরে গত ১০ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৪, দশ দিন ব্যাপী সংস্কৃত শিবির অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতভারতী'র মেদিনীপুর শাখার ব্যবস্থাপনায়। শিবিরে ৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক ছিলেন টোটন ভৌমিক ও সনাতন দাস। সংস্কৃত ভাষাকে জনমুখী করে তোলার জন্য সংস্কৃতভারতী'র এই প্রয়াস। শিবির পরিদর্শন করেন খড়্গপুর মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান ড. জগমোহন আচার্য। সমাপ্তি কার্যক্রমে ভাষণ দেন সংস্কৃতভারতী'র দক্ষিণবঙ্গের সংগঠক প্রণব নন্দ। তিনি বর্তমান সমাজে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

উত্তর কলকাতায় সংস্কৃত শিবির

উত্তর কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সিঁথির মোড়ে শরণ্য মাতৃসেবা সঙ্ঘে গত ১৫-২৫ এপ্রিল ২০১৪, দশ দিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির হলো সংস্কৃতভারতী'র কলকাতা শাখার ব্যবস্থাপনায়। প্রায় ২২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক ছিলেন কার্তিক ধর। মাতৃসেবা সঙ্ঘের সভাপতি কুলদানন্দ মহারাজ উপস্থিত সকলকে সংস্কৃত আধারিত জীবন গঠনের আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতভারতী'র সংগঠক প্রণব নন্দ।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস

সংবাদদাতা॥ ২০ জুন ১৯৪৭ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় হিন্দু বিধায়করা ৫৮.২১ ভোটে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা গোটা বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না, হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে বাঙালি হিন্দুর জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামে এক পৃথক রাজ্য গঠন করবেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণে রেখে আমাদের উচিত প্রতি বছর এই দিনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা।

ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের একটা করে রাজ্য দিবস আছে, নেই শুধু পশ্চিমবঙ্গের। কারণ কংগ্রেস, বাম বা তৃণমূল কোনো দলই চায়নি এই দিনটাকে পালন করতে। তারা চেয়েছে বাঙালি হিন্দুকে আত্মবিস্মৃত করে রাখতে। প্রকৃত ইতিহাসকে চেপে রাখতে। নয়ত তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি চলবে না। এই অবস্থা থেকে বাঙালি হিন্দুকে মুক্তি দিতে পারে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এই আশায় অধ্যাপক মোহিত রায়ের উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য' একটি গোষ্ঠী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে উদ্যোগী হয়েছে।

স্বস্তিকা

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

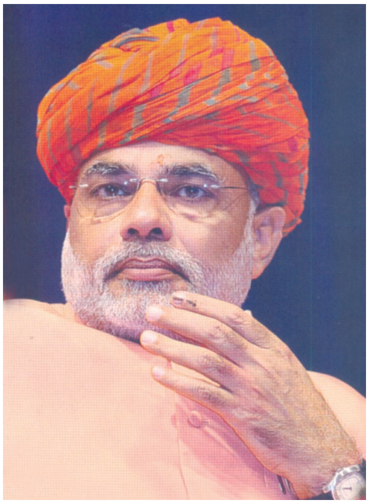

মোদীজী : বিয়ন্ড বাউন্ডারি

নীতিন রায়

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী সবকিছুর আরম্ভ ও সীমানা ভেঙে দিয়ে দেশকে নতুন যুগের সন্ধান দিয়েছেন। ৩৩৬টি আসন পেয়েছে এনডিএ। বিজেপি একা পেয়েছে ২৮২টি আসন। নতুন সরকার নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং তার জন্য কাউকে নজরানা দিতে হবে না। আঞ্চলিক দলগুলো দেশপ্রেমহীন দাবি দাওয়া ও ব্যক্তিস্বার্থের দরাদরি সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই মানুষ ভোটের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। মোদীজী সমস্ত অনুমান বিশ্লেষণকে পিছনে ফেলে নিজেকে শক্ত-সমর্থ কঠিন ও উন্নয়নমুখী সংবেদনশীল মানুষ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আশা-আকাঙ্ক্ষার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন তিনি।

পারিবারিক সীমা অতিক্রম : ভাদোদরার এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম। ধীরে ধীরে পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে তিনি দেশের কাজে নেমে পড়ে।

অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনে স্ত্রী সংসর্গ হতে দূরে থেকে আর এস এস-এর প্রচারক হন। আবার সন্ন্যাসী হতে আসেন কলকাতায় বেলুড় মঠে। সন্ন্যাসী হতে পারেননি। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে দেশের কাজ করে যেতে বলেন। তবুও তিনি আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যান। সেখান থেকে হিমালয়, তারপর ফিরে আসেন বাড়ি। সবই যেন দিগন্ত রেখার বাইরে।

নরেন্দ্র মোদীর চিন্তার জগত : তিনি অর্ধেক জলে ভরা গ্লাসকে কখনও অর্ধেক ফাঁকা ভাবেন না, তা হাওয়ায় পূর্ণ ভাবেন। আসলে সবাই যা ভাবে তিনি তেমন ভাবে ভাবেন না। ধরুন, সরকারি কর্মচারীদের কনফারেন্সে গতানুপাতিক ভাবে উচ্চ আধিকারিকরা কথা বলেন আর নিম্ন আধিকারিকরা তা শোনেন। কিন্তু তিনি শুরু করলেন নিম্ন আধিকারিকরা বলবেন আর উচ্চআধিকারিকরা শুনবেন।

১৫, ১৬, ১৭ জুন প্রচণ্ড গরমে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চ আধিকারিকদের গ্রামে যেতে হয়। স্কুলছুটদের স্কুলে পৌঁছনোর জন্য। গ্রামে থাকতে হয় তিন দিন। তিনি গতানুগতিক পথে না চলে বিপরীত দিক দিয়ে ভাবেন। তিনি এদিক দিয়ে সীমানা অতিক্রমকারী চিন্তক।

হিন্দুত্ব ও বিকাশ : হিন্দুত্ব ও বিকাশ একে অপরের পরিপূরক তিনি তা প্রমাণ করেছেন। হিন্দুত্ব মানে যে কল্যাণযুক্ত উন্নয়ন—এটা গুজরাটের বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। তিনি বিকাশকে যখন প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছেন তখন ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষরা অন্য পথে চালিত করতে চেয়েছেন। তিনি সংবাদ ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছেন বার বার।

গণিত ও রসায়ন : নরেন্দ্র মোদী দেশ চালানো ও সরকার-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। গণিত দিয়ে সরকার গঠন ও সরকার চালনা করা যেতে পারে, তাতে দেশ গঠন হয় না। কিন্তু সরকার যদি রসায়নের দিকে মনোযোগ দেয় অর্থাৎ সবার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নে মদত দেয় তবে সে উন্নয়ন হবে সহজতর।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভণ্ডামি : ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামিকে সামনে নিয়ে এসেছেন মোদীজী। তিনি বিকাশের বিকাশ তত্ত্বকে ১২৫ কোটির নামে উৎসর্গ করেছেন। যার অর্থ ধর্মমত নির্বিশেষে বিকাশের সুফল লাভ করবে। সরকারি নীতি কোনো সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং সার্বিক উন্নতির জন্য।

নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতা : নরেন্দ্র মোদী বক্তৃতা দেন ইন্টারেকটিভ বা পার্টিসিপেটিভ পদ্ধতিতে। ভারতবর্ষে এই ধরনের বক্তৃতা প্রথম— জনতাকে তিনি প্রশ্ন করেন এবং জনতা উত্তর দেয়। জনতা চুপ করে থাকলে তিনি এগিয়ে যান। এই ধরনের বক্তৃতায় জনতা মোটিভেটেড হয়।

তাঁর বক্তৃতায় মাত্রার রেশ ও দেশওয়ালি ঢং আছে যাতে জনতা সহজে নিজের বলে ভাবতে পারে। এর আগে কোনো নেতা এইভাবে বক্তৃতা করেননি।

পরিশ্রম করার ক্ষমতা : পরিশ্রম করার ক্ষমতা অত্যধিক। সঙ্ঘের অভ্যেস তাঁকে আরও পরিশ্রমী করে তুলেছে। তিনি এই নির্বাচনে যা প্রয়োগ করেছেন—

(১) ২৫টি রাজ্যে ঘুরেছেন। (২) ৩ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করেছেন। (৩) তিনি ৫৮২৭টি জনমুখী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন। (৪) তিনি ৩ডি বক্তৃতায় ১৩৫০ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। (৫) প্রতিদিন ২০ ঘণ্টা কাজ করেছেন।

অন্যান্য বিষয় :

(১) ট্যুইটারে তাঁর নাম আসে ১ কোটি ১১ লক্ষ বার। (২) সোস্যাল মিডিয়াকে সুনিপুণ ভাবে ব্যবহার করেছেন।

নির্বাচন মন্থন করে যা উঠে এসেছে :

(১) ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ১২৮ ভোটে জিতেছেন মোদীজী। যা আগে কেউ এই ব্যবধানে জেতেননি। (২) কোনো অকংগ্রেসী দল এর আগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। (৩) কোয়ালিশন রাজনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (৪) ভোটার টার্নআউট রেকর্ড মার্ক ছুঁলো। তা হলো ৬৬.৪ শতাংশ। (৫) কংগ্রেস এই প্রথম ৭টি রাজ্যে খাতা খুলতে পারেনি এবং কোথাও ডাবলডিজিট সংখ্যা স্পর্শ করেনি। (৬) এমন একজন প্রধানমন্ত্রী হলেন যিনি ভারত-ভাগের পর জন্মেছেন। (৭) সংখ্যালঘু ভোট ছাড়া ভারতবর্ষ শাসন করা যাবে না— এই মিথ ভেঙে দিয়েছেন। (৮) ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির ভরাডুবি ঘটেছে। তোষণ নয়, উন্নয়নই ভারতকে বৈভবশালী করবার এক মাত্র পথ।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

নেত্রদান মহাদান

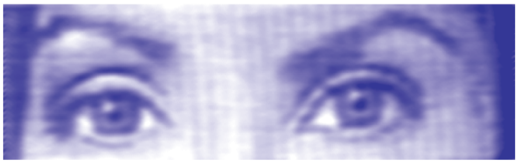

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

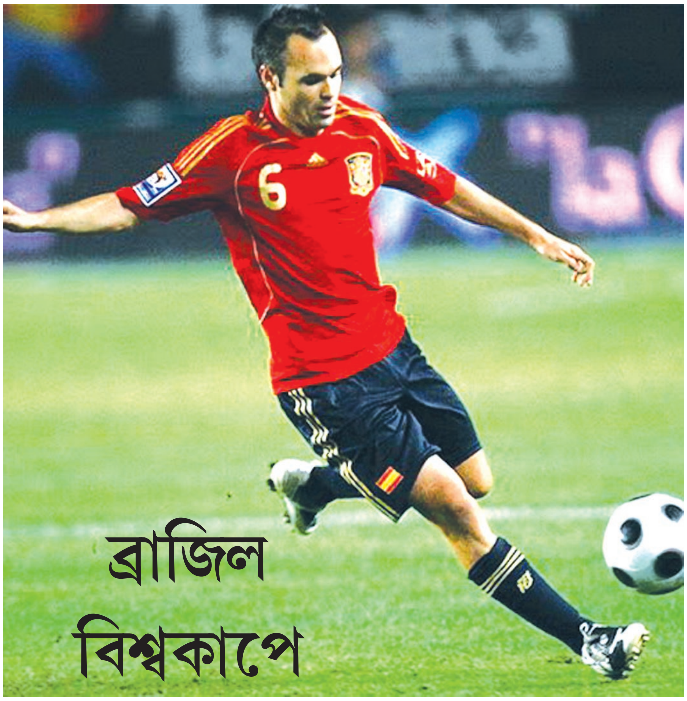

ব্রাজিল বিশ্বকাপে ফেভারিট স্পেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও একবছর আগে কনফেডারেশন কাপের ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে শোচনীয় হার স্বীকার করতে হয়েছিল স্পেনকে, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আধুনিক ফুটবলের ব্যাকরণ প্রকরণের নিরিখে স্পেনই সর্বশ্রেষ্ঠ দল। ব্রাজিলের মাটিতে এক বছর আগে কি হয়েছিল, তা ভুলে গিয়ে এই বিশ্বকাপে স্বমূর্তি ধারণ করে খেলবে স্পেন। কোচ ভিসেন্তে দেল বস্কি জানেন এবারের বিশ্বকাপ জিততে পারলে তিনি নিজে ও স্পেন ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে। যে ইতিহাস আজ পর্যন্ত কোনো দেশ রচনা করতে পারেনি। কি সেই ইতিহাস? না পরপর দু'বার বিশ্বকাপ ও ইউরো কাপ জেতার অনন্যসাধারণ নজির। ২০০৮, ২০১২-তে স্পেন ইউরো কাপ জেতে। মাঝে ২০১০-এ বিশ্বকাপ। এই কৃতিত্ব ভাঙা বা স্পর্শ করা অদূর ভবিষ্যতে কোনো ইউরোপিয়ান দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আর স্পেনের যা দলগত শক্তি ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের আধারপুষ্ট খেলোয়াড়ের বরে, তাতে বিশ্বকাপ জেতা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

কোচ দেল বস্কি এই মুহূর্তে বিশ্বফুটবলের সবচেয়ে ক্ষুরধার ট্যাকটিশিয়ান। রক্ষণ ও আক্রমণে ভারসাম্য রেখে দল সাজান। খেলোয়াড়দের কাছে ফাদার ফিগার। গেম রিডিং দুর্দান্ত। রিজার্ভ বেঞ্চকেও সমান চনমনে ও সুসংহত করে রাখতে পারেন। প্রতিটি দলের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝে একাধিক স্ট্রাটেজি ঠিক করে দলকে মাঠে নামান। আর স্পেন দলেও এমনসব খেলোয়াড় আছেন যাঁরা যে কোনো ফর্মেশনে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। জাভি, ইনিয়েস্তা, ফাব্রেগাম, টোরেস, ভিয়া আর নতুন তারকা ব্রাজিল জাত দিয়াগো। কোস্তা যে দলে আছেন, তাদের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের বিশেষ কিছু করতে হয় না। প্রত্যেকেই বিশ্বমানের খেলোয়াড় ও খেলার গতিপ্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রণ করে ম্যাচ বের করে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত। গোলকিপার ক্যাসিয়াসের অভিজ্ঞতাও একটা বড় ফ্যাক্টর। ডিফেন্সের পুত্তল, পিকে, র‍্যামোসরা মিলে যে চক্রব্যূহ রচনা করেন, তা ভেদ করে গোল করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তিন পজিশনের মধ্যে রয়েছে ভারসাম্যের সুসংহত বিন্যাস। আর রয়েছে সহজাত নেতৃত্ব দিতে সক্ষম খেলোয়াড়। তবে স্পেনকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিতে পারে আয়োজক দেশ ব্রাজিল। ব্রাজিল এখন ডিফেন্স জমাট রেখে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছে। কোচ স্কোলারি যদিও রোনাল্ডিনহো, রবিনহো, কাকার মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার নিয়ে চলার পক্ষপাতী নন তবে এদের অভাবে সেভাবে দলকে ভুগতে হবে না বলে টিম ম্যানেজম্যান্টের ধারণা। দলগত সংহতিকে সম্বল করে প্রেসিং ফুটবল খেলে। তারকা খেলোয়াড়ও আছেন কয়েকজন। প্রতিবেশী দেশ। হল্যান্ড তিনবারের ফাইনালিস্ট। টোটাল ফুটবলের জন্মদাতা দেশ একবারও বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পারেনি এ ব্যাপারটা মর্মপীড়ার কারণ। এবার যা দল হয়েছে হল্যান্ডের, ভাগ্য সহায় থাকলে এই বিশ্বকাপ হল্যান্ডের হতেই পারে। অর্জুন রুবেন, স্নেইডার, বুস্কেটস, ফানপার্সির মতো অলরাউন্ড ফুটবলার, লুই কান গলের মতো তাত্ত্বিক স্ট্রাটেজিস্ট কোচ হল্যান্ডের সম্পদ ও স্বপ্ন পূরণের 'মেসিয়া' ইউরোপে এবছর ক্লাব ফুটবলে ডাচ ফুটবলাররা যে খেলা খেলেছেন তা যদি বিশ্বকাপে দেখাতে পারেন তবে হল্যান্ডের এবার ভিকট্রিপোডিয়ামে দেখা যেতে পারে।

আর্জেন্টিনা, পর্তুগালকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। এই দু'টি দল যদিও ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল কতিপয় ফুটবলারের দিকে তাকিয়ে আছে। আর্জেন্টিনার রক্ষাকবচ লিওনেল মেসি, আগুয়েরা জিওইন, আর ডিপ ডিফেন্সে জাবালেতা, ডেমিসেলিস। এই পঞ্চপাণ্ডব যদি এক সুরে ছন্দবদ্ধ ঐক্য মেলে ধরে খেলতে পারেন, তবেই আর্জেন্টিনার খেলায় আসবে প্রত্যাশিত সৌন্দর্য ও ইতিবাচক ফলাফল। মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো, রোনাল্ডের কাছে এবারের বিশ্বকাপ অগ্নিপরীক্ষা। মেসি একবার অলিম্পিক ফুটবলে সোনা জিতিয়েছেন আর্জেন্টিনাকে। তবে বিশ্বকাপে নিজের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। এই মুহূর্তে বিশ্বফুটবলের রাজপুত্র বলা হচ্ছে মেসিকে। তাঁর যথার্থ মৃগয়া ক্ষেত্র বিশ্বকাপ। সেখানে যদি এবারও শিকার ধরতে ব্যর্থ হন তবে চিরস্থায়ী তকমা এঁটে থাকে তার পিঠে 'বন্যেরা বনে সুন্দরের মতো মেসি সুন্দর বার্সেলোনায় ক্লাব ফুটবলে।' একই কথা প্রযোজ্য রোনাল্ডো সম্পর্কেও। পর্তুগালকে একবার ইউরো কাপ ফাইনালে তুলেছিলেন। বিশ্বকাপে তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি। এবছর 'ব্যালেন ডি অনার' পেয়েছেন। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ মঞ্চে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার কি ঝলসে উঠবেন? এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর মনে। তবে রোনাল্ডোর দলে নানি ছাড়া বিশ্বমানের ফুটবলার তেমন একটা নেই। সব পজিশনে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ফুটবলারের অভাবে ভুগতে হবে পর্তুগালকে। আর ফুটবল সম্রাট পেলে এই কটি দল ছাড়াও ইতালি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের দিকে নজর রাখতে বলেছেন।

শব্দরূপ-৭১০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

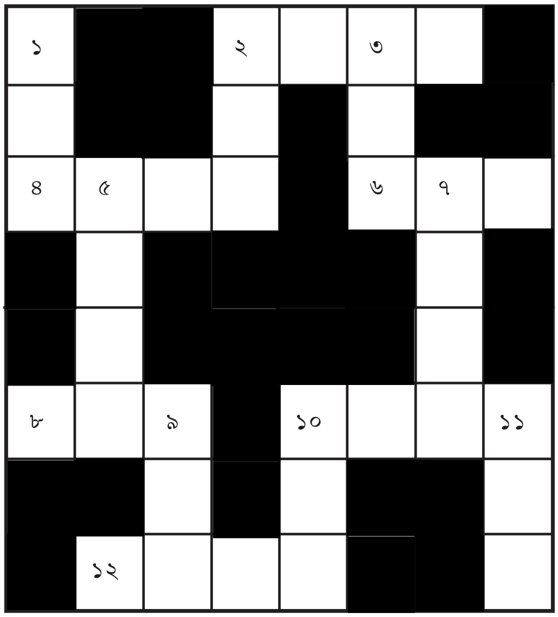

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. দেবতার মূর্তিগ্রহণ ও সংসারে আগমন, ৪. প্রদীপের পোকা, ৬. দশমহাবিদ্যার এক, রাজরাজেশ্বরী, ৮. 'মোদের—, মোদের আশা/আ মরি বাংলাভাষা' ১০. ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত জবালার পুত্র, ১২. খড়্গ; পৌরাণিক রাজা বিশেষ; প্রথম দুয়ে চাঁদ।

উপর-নীচ : ১. পূর্ব দিক, ২. দুর্গা, মহাভারতে কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা, ৩. কার্তিকেয় কর্তৃক নিহত অসুর বিশেষ; উদ্ধারকর্তা, ৫. যে ফুলের মালা তৈয়ারী করে, ৭. বসন্ত রোগ, ৯. প্রাচীন গৌড় দেশ, উত্তরবঙ্গ, ১০. সংসার-বাসনাত্যাগ; চতুর্থাশ্রম, ১১. মৃতবৎস্যা, যে নারীর সন্তান বাঁচে না।

সমাধান
শব্দরূপ-৭০৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
শুভম চৌধুরী
বসিরহাট, কোচবিহার

■	■	স	প্ত	প	দী	■	জ
ব	স	ন্ত	■	■	প	■	টি
■	ং	■	শ	■	ক	ম	লা
■	শ	কু	নি	■	■	গু	■
■	প্ত	■	■	শ	ম	ন	■
ম	ক	র	■	স্তু	■	মি	■
ৎ	■	ভ	■	■	স	শ্র	ম
স্য	■	স	ত্য	ব	তী	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭১০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৩ জুন, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৮

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলায় দেশত্যাগীদের ফিরিয়ে আনার দাবী

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনের কারণে যারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে এনে যথাযথ মর্যাদায় পুনর্বাসিত করার দাবি জানিয়েছে। ২৩ মে পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি ও জাতীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর এক যৌথসভা থেকে এ দাবি জানানো হয়।

পরিষদের সভায় 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' প্রত্যাহার করে বাহাত্তরের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান দাবি করা হয়েছে।

সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় বিএনপি ও জামায়াতের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের লোকজনও অংশগ্রহণ করছে। এই প্রবণতা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলেন, গত বছর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণার পর থেকে সারাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা শুরু হয়েছে এখনো নানাভাবে তা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে বহু জেলা থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন, অনেক এলাকায় সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিষদ নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের জায়গাজমির এখন দাম কমে গেছে। কারণ আশেপাশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন মনে করছেন, সংখ্যালঘুরা আরও কম দামে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবে অথবা তাদেরকে জায়গাজমি ফেলে দেশত্যাগ করতে হবে। ঐক্য পরিষদ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করার জন্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

পরিষদের অন্যতম সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির নেতা ঊষাতন তালুকদার এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি, মনোরঞ্জন শীল এমপি, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, ঐক্য পরিষদের মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র সম্পাদক বাসুদেব ধর, দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত, কাজল দেবনাথ, এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ খৃস্টান অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্মল রোজারিও, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়-সহ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টাগণ। সভায় আরও বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণীত হলেও আমলাদের চক্রান্তে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সরকারকে এ ব্যাপারে জানানো হলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে না। সভায় আগামী নভেম্বরে ধর্মীয় ও জাতিগত সব সংখ্যালঘু সংগঠনের সমন্বয়ে কনভেনশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঢাকায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের মিছিল।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
2 June - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা